দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

এরাজ্যে 'তেজস্বিনী' শক্তি হারিয়েছেন, রাজনৈতিক 'পরিবর্তন' অবশ্যম্ভাবী
— পৃঃ ৮

খিলাফত ও অসহযোগ গান্ধীজীর অপরিণামদর্শিতার ফল ভুগছে ভারত
— পৃঃ ২০

৭৩ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ২৩ নভেম্বর ২০২০।। ৭ অগ্রহায়ণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

বিহারে মোদী-ম্যাজিক আউট

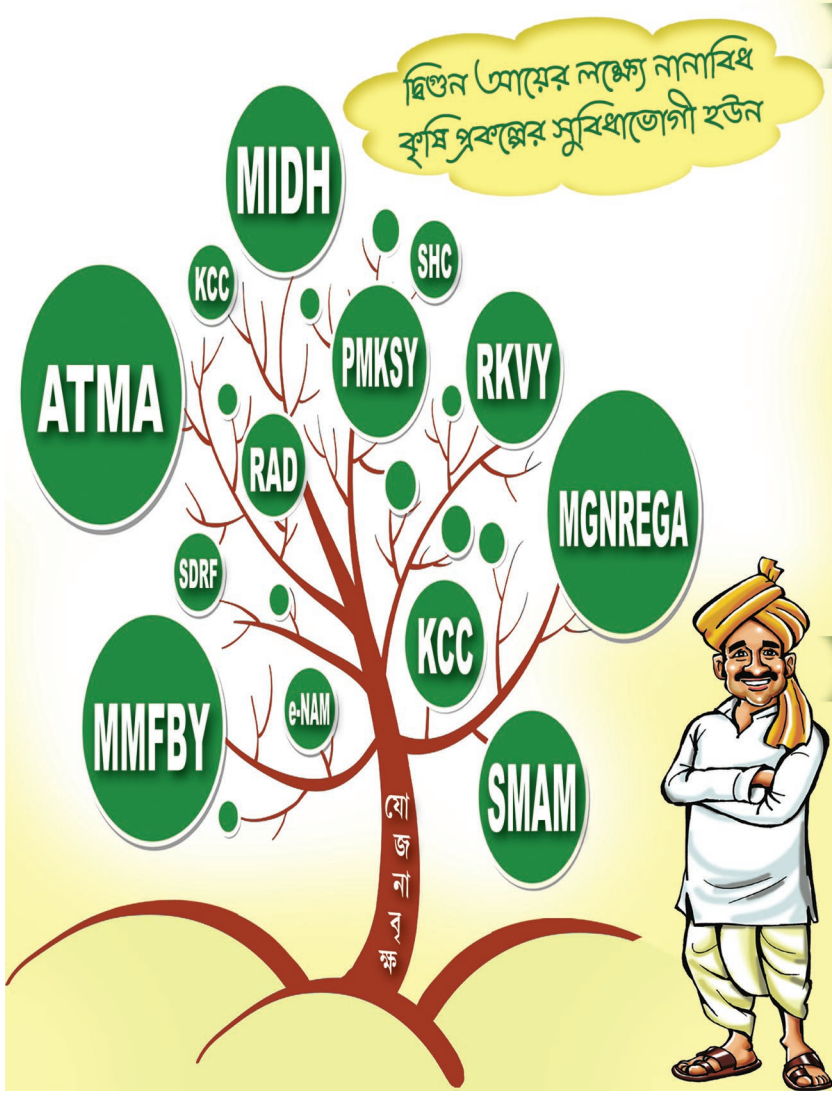

অগ্রগতির পথে দুর্গাচৌমুহনী কৃষি মহকুমা
দ্বিগুন আয়ের লক্ষ্যে নানাবিধ কৃষি প্রকল্পের সুবিধাভোগী হউন
MIDH
SHC
KCC
PMKSY
RKVY
ATMA
RAD
MGNREGA
SDRF
KCC
e-NAM
MMFBY
SMAM
যোজনা বৃক্ষ
চাষীভাইদের সফল কৃষি পরিক্রমায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পাদি
NFSM : জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন
MMFBY : মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা
ATMA : কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যম
PMKSY : কৃষি নির্ভরতায় জলসেচের মাধ্যম
MIDH : উদ্যান চাষ উন্নয়ন সম্বন্ধীয় যোজনা
MGNREGA : গ্রামীন স্বনির্ভরতার লক্ষ্য সম্বন্ধীয় যোজনা
KCC : কৃষি ঋন সম্বন্ধীয় মাধ্যম
SMAM : কৃষি যান্ত্রীকিকরন
RKVY : রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন যোজনা
SHC : মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্বন্ধীয় যোজনা
RAD : বৃষ্টিহীন এলাকার উন্নয়ন সম্বন্ধীয় যোজনা
SDRF : প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় অনুদান প্রকল্প
KCC : কৃষিক্ষেত্রে যেকোন সমস্যা সমাধানে উপদেষ্টামূলক কেন্দ্র
e-NAM : রাষ্ট্রীয় কৃষি বাজারজাতকরন
চাষবাস সম্বন্ধীয় বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
১) কৃষি তত্ত্বাবধায়ক এর কার্য্যালয়,
দুর্গাচৌমুহনী কৃষি মহকুমা, কমলপুর, ধলাই।
২) কৃষক বন্ধু কেন্দ্র, কমলপুর।
৩) টেকনিকেল গ্রুপ -
মুঠোফোন - ৯৬১২৮৩৩৭৮৭ / ৬০০৯২১৫৬৩৫
৪) কৃষি আঞ্চলিক কার্য্যালয়
(ক) কমলপুর (খ) বামনছড়া

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৩ নভেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

হিন্দুত্বের ধারক Indigenous People of India
▯ অজয় সরকার ▯ ৫

এ রাজ্যে 'তেজস্বিনী' শক্তি হারিয়েছেন— রাজনৈতিক 'পরিবর্তন' অবশ্যম্ভাবী ▯ সুজিত রায় ▯ ৮

বিহারে মোদী-ম্যাজিক অটুট, এবার গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ
▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ১১

বিহার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বঙ্গ রাজনীতির সম্ভাব্য নতুন সমীকরণ ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ১৪

আবার উন্নয়নের পক্ষেই সওয়াল বিহারের জনতার
▯ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী ▯ ১৬

পশ্চিমবঙ্গে শক্ত ভিত গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে ওয়েসির
▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৭

জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের তফাতটা বাঙ্গালিকে ধরতে হবে ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ১৮

খিলাফত ও অসহযোগ : গান্ধীজীর অপরিণামদর্শিতার ফল ভুগছে ভারত ▯ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২০

জয় ভীম স্লোগানের অন্তরালে জয় মিম
▯ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৪

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ছিলেন কমলনাথের ভাগনে রাতুল পুরী ▯ ঋতু সারিন ▯ ২৬

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এখন যেভাবে এগোচ্ছে ▯ ২৮

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা
▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ৩০

মৌলবাদীদের উত্থান বাংলাদেশের ক্ষতি করবে
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩২

রাষ্ট্রবাদী কৃষক সমাজের মুখপত্র ভারতীয় কিষাণ বার্তা
▯ তন্ময় দে ▯ ৩৪

সঠিক খাদ্য চয়নের মাধ্যমে থাইরয়েডের সমস্যা থেকে মুক্তি
▯ ত্রিয়া সিংহ ▯ ৩৬

বেদনা অতুলপ্রসাদের সংগীতের প্রধান অবলম্বন
▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ৩৭

বারুইপুরে রাসমেলা ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৮

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গকে কলঙ্কমুক্ত হইতেই হইবে

সদ্যসমাপ্ত বিহার রাজ্য নির্বাচনে ভোট বিশ্লেষকদের সমস্ত অনুমান ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকেই জয়যুক্ত করিয়া বিহারবাসী পুনরায় নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের ধারা চলমান রখিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে বিহারবাসী জঙ্গলরাজ ও গুন্ডারাজের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলিতে আর ফিরিতে চাহেন না। আরও প্রমাণিত হইয়াছে, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে বিহার শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বাদ পাইয়াছে। তাই তাহারা নরেন্দ্র মোদীর প্রতিই আস্থা রাখিয়াছে। সবচাইতে বড়ো কথা হইল, বিহারবাসী রক্তপাতহীন রাজনীতি ও নির্বাচনের স্বাদ পাইয়াছে। যে বিহার তথা মগধ রাজ্য একদা শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী রাজ্য হিসাবে পরিচিতি পাইয়াছিল, তাহা কয়েক দশক পূর্বে স্বার্থন্বেষী রাজনীতিকদের হাতে পড়িয়া জঙ্গলরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এক দশক পূর্বে বিহারবাসী সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছে। এইবারেও সেই ধারা তাহারা অব্যাহত রাখিয়াছে।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সময় আসিয়াছে বিহার হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার। মগধের মতোই বঙ্গপ্রদেশেও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিল বঙ্গপ্রদেশ। তাই বোধহয় মনীষী গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, ‘ আজ বাঙ্গলা যাহা ভাবিতেছে, আগামীকাল ভারতবর্ষ তাহা ভাবিবে।’ স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র তিনটি দশক পর বাঙ্গলা সেই গৌরবের শিখর হইতে পতিত হইয়াছে। এই পতনের সূচনাটি হইয়াছে বিজাতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ সংবলিত বামফ্রন্টের হাত ধরিয়া। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা লালঝান্ডা উড়াইয়া এই রাজ্যের মাটি মানুষের রক্তে লাল করিয়াছে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাঙ্গলায় তাহারা রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতার জন্ম দিয়াছে। শ্রেণীশত্রু খতমের নামে রাজনৈতিক বিরোধীদের ঘরছাড়া করা, এরঘরে করা, লালঝান্ডা লাগিয়ে জমি দখল করা, খেতের ফসল লুঠ করা, মিথ্যা মামলা ফাঁসাইয়া দেওয়া, খুন-জখম, মহিলাদের ইজ্জত লুণ্ঠন ইত্যাদি অবলীলায় তাহারা করিয়াছে। শ্রেণীশত্রু খতমের নাম দিয়া তাহারা সাঁইবাড়ি ও আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে। বাঙ্গলার মানুষ এই অরাজকতা হইতে মুক্তি চাহিতেছিল। পরিত্রাণের জন্য মমতা ব্যানার্জির ভুইফোড় তৃণমূলদলে আস্থা রাখিয়াছিল। মাত্র কয়েক বৎসরেই বঙ্গবাসীর মোহমুক্তি ঘটিল। বাম রাজত্বের সেই দুর্দিনগুলি আরও শত-সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ঘোর দুর্দিনে পরিণত হইল। সেই একই রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা, সেই একই বিরোধী খতম নীতি। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ ও জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক সংরক্ষণ। বিরোধী শক্তিকে নিকাশ করিতে জেলায় জেলায় গড়িয়া উঠিয়াছে বোমা কারখানা। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শতাধিক প্রাণ বলি হইয়াছে। খুনের রাজনীতি অব্যাহত। পশ্চিমবঙ্গ বিহারের জঙ্গলরাজকেও হার মানাইয়াছে। বঙ্গবাসী আজ বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেছে।

এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতেছে, বিহার পারিলে পশ্চিমবঙ্গ পারিবে না কেন? উত্তর হইল, নিশ্চয় পারিবে। ইহার সমস্ত শুভ লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই সন্ত্রাস, এই অরাজকতা, এত প্রাণহানি, এই জঙ্গলরাজ বঙ্গবাসী আর দেখিতে চাহে না। এই কলঙ্কভার অপনোদনের জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে। ভারতীয় জনতা পার্টির ছত্রছায়ায় মানুষ সংগঠিত হইতেছে। লোকসভায় এই রাজ্য হইতে ১৮ জন প্রতিনিধি তাহারা প্রেরণ করিয়াছে। দিন দিন ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। রাজ্যের মানুষ নিশ্চিত করিয়াছে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই কলঙ্ক মোচন করিতেই হইবে। বাঙ্গালি তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিবেই।

সুভাষিতম্

পাণ্ডিত্যং যন্মদান্ধানাং পরোৎকর্ষবিনাশনম্।

মাৎসর্যপাংসুপূরেণ মাতঙ্গস্নানমেব তৎ।।

হাতি যেমন স্নানের পর নিজ শরীরে কাদা নিক্ষেপ করে, তেমনি পাণ্ডিত্যের অহংকারে আচ্ছন্ন লোকের জ্ঞান অন্যের প্রগতির পরিপন্থী হয়।

হিন্দুত্বের ধারক
Indigenous People of India

অজয় সরকার

১৯৯০ সালের আগে প্রতি বছর ৯ আগস্ট দিনটি 'কলম্বাস ডে' রূপে পালিত হতো। এখন এই দিনটি International day of the world's Indigenous people রূপে পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়। সময়ের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী থিম ঠিক করা হয়। এ বছর যে থিমটি নেওয়া হয়েছে, তা হলো, 'Covid-19 and Indigenous People's Resilience'। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পৃথিবীর ৯০টি দেশে কম-বেশি ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ Indigenous মানুষ রয়েছেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, এই Indigenous লোকজন বলতে যাদের চলতি ধারণা দিয়ে বুঝানো হয়, তারা সন্দেহাতীতভাবে বঞ্চনার শিকার। এই বঞ্চনা খাদ্য, বাসস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই বৈষম্য অস্বস্তিকরভাবে প্রকট। জীবন ধারণের ন্যূনতম উপাদানসমূহ, যেমন পানীয় জলের নিশ্চয়তা এদের দৈনন্দিন জীবনে দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। আমরা অনেকেই জানি না যে, পৃথিবীর ৮৬ শতাংশ Indigenous people informal অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, Indigenous people-দের ৪৭ শতাংশের কোনো প্রথাগত শিক্ষা নেই।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, সারা পৃথিবী করোনা আতঙ্কে এক ভীত সন্ত্রস্ত জীবনযাপন করছে। সবচেয়ে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ইতালি, আমেরিকা বা ইউরোপের ধনী দেশগুলো অসহায় বোধ করছে। আতঙ্কের এক কালো অন্ধকার যেন মানবজাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এতদসত্ত্বেও কেভিড-১৯-এর করাল থাবা এদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাণোচ্ছলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে সারা পৃথিবীতে Indigenous people-দের কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনি সব স্থানে একই রকম নয়। যেমন, আমাদের দেশের Indigenous লোকজনের কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনি পৃথিবীর অপরাপর অংশের কাহিনি থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। আর এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

আজ যে দেশকে আমরা আমেরিকা বলি, সেই দেশটা রেড ইন্ডিয়ানদের ছিল। মেরে কেটে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ, জার্মানরা আমেরিকার প্রভু হয়ে গেল। উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলো নিজ ভূমে পরবাসী হলো।

প্রথমেই একটা বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে 'Indigenous people' বলতে আমরা কাদের বুঝি। একটা ধারণা আমাদের মননে ও সত্তায় সযত্নে প্রোথিত করা হয়েছে যে , আমরা ভারতীয় বলতে যাদের বুঝি, তারা Indigenous people নয়। আমরা সব বাইরে (এশিয়া মাইনর) থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। এমনকী, স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যবইতে লেখা হলো রাম শব্দের উদ্ভব হয়েছে ইংরেজি 'Roaming' থেকে। শিক্ষকরা এটা পড়ান, শিশুরা শেখে। অনেক শিক্ষক বোঝেন কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পান না, কারণ দেশের অনেক রাজ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র জোর চাষাবাদ চলছে। শেখানো হলো, এই দেশের যারা আদি জনগোষ্ঠী বলে পরিচিত, তারা হলো Indigenous people। ইউরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গ লোকজন আমাদের জন্য আমাদের বাপঠাকুরদার ইতিহাস বনিয়ে দিল। আমরা শূকরের বিষ্ঠা ভক্ষণের মতো সেটি গোগ্রাসে গিলে নিজেদের ধন্য মনে করলাম।

প্রথমেই এ ভুল ধারণা সংশোধন করা দরকার। ইংরেজদের দরকার ছিল তাদের 'লুঠের শাসনকে' বৈধ বলে প্রতিষ্ঠা করার। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষা অধিকর্তা মেকলে সাহেব জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেবকে ভাড়া করেছিলেন যেন তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্বটি একবার দাঁড়িয়ে গেলে ব্রিটিশদের ভারতকে লুঠ করতে সুবিধা হতো। বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের অনৈতিকতাকে নৈতিক বলে ছাড়পত্রও পাওয়া যেত। টাকার লোভে গদগদ ভাড়াটে ম্যাক্সমুলার উদ্ভাবন করে

ফেললেন, 'আর্য আগমন তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে ঢোকানো হলো... আমরা পড়লাম... আমাদের সন্তানদের মগজে ঠেসে ঠেসে ঢুকালাম... আমরা আজও পড়ি এবং এসব পড়ে চাকরি পাই। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো, আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছে, এখানকার জনজাতি লোকজনকে মারপিট করে তাদের নিজ ভূমি থেকে তাড়িয়েছে, মার খেয়ে লোকজন বনে-জঙ্গলে পালিয়েছে। এইসব লোকজনদের একটা অংশ আবার আর্যদের সংস্পর্শে এসে কিছুটা উন্নতিও করেছে। এই বদমায়েশি ভাবনার সঙ্গে ঠেকা দেওয়ার জন্য তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন, 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' নামে এক বিদঘুটে অবাস্তব তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হলো সংস্কৃত, পারসি, গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা Proto-Indo European নামক মূল ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো , ম্যাক্সমুলার সাহেব তার মতের স্বপক্ষে কোনো সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখাতে পারলেন না। ভেবেছিলেন যে তালেগোলে পার পেয়ে যাবেন। তা আর হলো না। তখন তার অনুচররা প্রচার করতে লাগলেন যে, যেহেতু PIE-এর উদ্ভব পশ্চিমি দুনিয়ায় হয়েছে, তাই আর্যরা পশ্চিম থেকে পূর্বে এসেছে। এই প্রচারের ফানুসও চুপসে গেল যখন আনাতোলিয়াতে হিট্টাইটদের সঙ্গে মিত্তান্নিদের চুক্তিপত্র প্রকাশ্যে এলো। এই চুক্তিপত্রে বৈদিক দেবতাদের নাম সাক্ষী হিসাবে দেখানো আছে। ম্যাক্সমুলার সাহেবের PIE তত্ত্ব মুখ থুবড়ে পড়লো। আবার হাতড়ে হাতড়ে পথ চলা শুরু হলো। ভারতে ইংরেজ শাসনের বৈধতার প্রয়োজনে একটা কিছু পণ্ডিতদের সিলমোহর মার্কা তত্ত্ব বের করতেই হবে।

উদ্ভাবিত হলো 'জাতি বিজ্ঞান' নামে এক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো যে ককেশীয় ইউরোপীয়রা নর্ডিক আর্য, আর কালো বা আধা কালো ভারতীয়রা অনার্য। হিটলারেরও তো একই কথা ছিল। সুতরাং ডঙ্কা বাজিয়ে দেওয়া হলো যে অনার্য ভারতীয়দের শাসন (শেষণ?) করার দৈবিক অধিকার ইউরোপীয়দের (ইংরেজদের) আছে। কিন্তু

> **"অতিমারী বা মহামারী ঈশ্বরের সৃষ্টিরই অংশ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আজ যখন আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র কোভিড-১৯-কে মানব জাতির শত্রু বলে ঘোষণা করেছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যান্টিজেন ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবডি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন এই আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রকৃতি মায়ের কাছে পরম নিশ্চিন্ততায় আশ্রয় নিয়েছে। কারণ এরা জীবন-মৃত্যুর রহস্য জানে।"**

বাস্তব বড়ো কঠিন ঠাঁই; কল্পকাহিনি দিয়ে কতদিন চলে? জাতিবিজ্ঞান নামের ফোলানো বেলুন চুপসে গেল যখন 'জিনতত্ত্ব' আবিষ্কৃত হলো। এই তত্ত্ব অনুসারে এম-১৭ নামে একটি জিনকে আর্যদের জিনগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখানো হলো। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, দেখা গেল এই জিন বৈশিষ্ট্য ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন মানবদের (কী বলবেন? Indigenous!!) মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কম কালো বা বেশি কালো নয়, সব ভারতীয়দের মধ্যেই এম-১৭ বেশি।

Indigenous শব্দের বাংলায় আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় 'দেশীয়'। অন্যদিকে, Tribes মানে জনগোষ্ঠী। প্রকৃত অর্থে দুটো শব্দই সমার্থক। পার্থক্য হলো প্রথমটি স্থানবাচক, দ্বিতীয়টি গোষ্ঠীবাচক। গোষ্ঠী বলতে একই ধরনের খাদ্যাভ্যাস, একই ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ, একই ধরনের ভাষা --- এক কথায়, একই ধরনের জীবনশৈলী নির্বাহকারী এক জনসমষ্টি। অর্থাৎ যখন আমরা Indigenous বলছি, তখন তার মধ্যেকার অপরিহার্য উপাদান রূপে 'জনগোষ্ঠী' থাকছে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো বিবিধতা এবং ভারত হলো বৈচিত্র্যময় জীবন পদ্ধতির এক চলমান মনোরম ছবি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মূলগত দিক থেকে ভারতের Indigenous people-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, Indigenous people সম্পর্কে ভারতীয় প্রেক্ষাপট পৃথিবীর বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, আজ যে দেশকে আমরা আমেরিকা বলি, সেই দেশটা রেড ইন্ডিয়ানদের ছিল। মেরে কেটে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ, জার্মানরা আমেরিকার প্রভু হয়ে গেল। উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলো নিজ ভূমে পরবাসী হলো। একইভাবে, মায়া ও ইনকা সভ্যতা ধ্বংস করে মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ শ্বেতাঙ্গরা চির অধিকারে নিয়ে নিল। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রথমে স্ক্যান্ডেনেভিয়ানরা এবং তার পরে অ্যাঙ্গলো, স্যাক্সনরা ওই দেশের ভূমিপুত্র কেল্টদের তাড়িয়ে দিয়ে ওই দেশের মালিক বনে গেল। এই যে আমরা ইংলিশ শব্দটা বলি, সেটাও তো Anglo এবং Saxon শব্দ থেকে এসেছে। এই Anglo, Saxon-রা তো জার্মানির লোকজন। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড বলুন বা আফ্রিকা বলুন, সর্বত্র এক চিত্র... জমির প্রকৃত মালিক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, আর শক্তিমানেরা সে জমি দখল করেছে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে

Indigenous people-এর ধারণা। সুতরাং এটা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে Indigenous people-এর যে ধারণা তৈরি হয়েছে, তা শ্বেতাঙ্গদের পৃথিবীজুড়ে প্রভুত্বকামী মানসিকতা এবং তাদের লোভাতুর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকে। ভারতীয় সমাজ জীবন পর্যালেচনা করলে দেখা যাবে যে, Indigenous people-এর চলতি ধারণা এদেশের প্রকৃত ইতিহাস এবং বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। ১৯৯০ সালের আগে 'International day of the world's Indigenous people' ছিল না। ৯ আগস্ট দিনটি পালিত হতো 'কলম্বাস ডে' নামে। সেই ক্রিস্টোফার কলম্বাস যিনি আমেরিকা আবিষ্কার (দখল) করে, সেখানকার ভূমিপুত্র রেড ইন্ডিয়ানদের নিজভূমে পরবাসী করেছিলেন। গালভরা নাম Indigenous people-এর জন্ম হয়েছিল সেদিন। নাম বদলে দিলেই কি প্রায়শ্চিত্ত হয়?

ভারতীয় জনগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের মৌলিক ভাবনার উত্তরাধিকার বহন করে। ভারত অনাদিকাল থেকে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র ভূমি। এ দেশের মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। প্রকৃতি নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের আগে অনেকে লিখেছেন, কিন্তু Pantheism- এর ভাবনার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় তো ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অথচ, স্মরণাতীতকাল থেকে হিন্দুরা প্রকৃতিকে পূজা করে এসেছে। হিন্দুদের কি বছরের এমন একটা মাস পাওয়া যাবে যে মাসে প্রকৃতি পূজা নেই? জন্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ সবেতেই হিন্দুরা প্রকৃতির কাছে যায়, প্রকৃতির আরাধনা করে এবং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায়। ভারতীয়রা আধ্যাত্মিকতাকে জীবনে উপলব্ধি করেছেন। এ তাদের কাছে তত্ত্বকথা নয়, জীবনশৈলীর এক অভিন্ন অংশ। অরুণাচল প্রদেশের 'গালো' জনগোষ্ঠী কোভিড-১৯-কে প্রতিরোধ করার জন্য গ্রাম জুড়ে বেড়া বসিয়ে নিজেদের Quarantine করেছে। মহামারী বা অতিমারী থেকে নিজেদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য তাদের সমাজে এই ধরনের প্রথা আবহমানকাল থেকে প্রচলিত। তাদের এই প্রথার নাম 'আলি-তারনাম'। আবার অরুণাচলের আরেকটি জনগোষ্ঠীর নাম 'আদি'। এরা এক অতীন্দ্রিয় শক্তির কাছে প্রার্থনা করেন যেন তাদের আরাধ্য দেবতা তাদের বনৌষধির বার্তা দেন। দেবতা তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং 'আদি' জনগোষ্ঠীর মানুষ সেই ওষুধ খেয়ে সুস্থ থাকেন। ছত্রিশগড়ের বস্তার জেলার জনগোষ্ঠী সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনকে তাদের জীবন পদ্ধতির অংশ মনে করেন। তারাও অরুণাচলের আদি বা গালো জনগোষ্ঠীর মতো প্রকৃতিপূজক। প্রকৃতি এবং পরিবেশের দেব-দেবীদের নাম হলো 'বনদেবী', 'বুদ্ধদেব', 'অঙ্গদেব' ইত্যাদি।

সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, জীবন নিয়ে তাদের আবহমানকাল থেকে তাদের লালিত বিশ্বাসবোধ। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুভ ও অশুভ শক্তি নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। অতিমারী বা মহামারী ঈশ্বরের সৃষ্টিরই অংশ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আজ যখন আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র কোভিড-১৯-কে মানব জাতির শত্রু বলে ঘোষণা করেছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যান্টিজেন ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবডি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন এই আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রকৃতি মায়ের কাছে পরম নিশ্চিন্ততায় আশ্রয় নিয়েছে। কারণ এরা জীবন-মৃত্যুর রহস্য জানে। এদের ৪৭ শতাংশ প্রথাগত শিক্ষা পায়নি বটে, কিন্তু জীবনের অর্থকে এরা এদের জীবন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে। হ্যাঁ, এদের জীবনে বেদনাদায়ক দিকও আছে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় ১৫০টি চা বাগান বন্ধ। প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক কষ্টে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র খুবই ভয়াবহ। কেন্দ্রীয় সরকার বিনে পয়সায় চাল না দিলে যে কী ভয়ংকরতার মুখে তাঁরা পড়তেন, তা অকল্পনীয়। এখানে শুধু বনবাসীরা নন, অপরাপর জনগোষ্ঠীর লোকজনও খুব কষ্টে আছেন।

তবু, তারা Resilient। করোনার সর্বগ্রাসী করাল রূপ তাদের জীবন থেকে আনন্দকে কেড়ে নিতে পারেনি। কারণ তাদের মধ্যে অনাদিকাল থেকে রয়েছে এক দৃঢ় বিশ্বাসবোধ। এ বিশ্বাসবোধ ঠুনকো নয়, কারণ হাজার হাজার বছর ধরে জীবনের অভিজ্ঞতায় তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বোধ তৈরি হয়েছে। এই বিশ্বাসবোধ তো মৌলিক, কারণ তারা জানে যে, শুভ বা অশুভ ঈশ্বরের সৃষ্টির দুটি ভিন্ন রূপ। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

এ রাজ্যে ‘তেজস্বিনী’ শক্তি হারিয়েছেন

রাজনৈতিক ‘পরিবর্তন’ অবশ্যম্ভাবী

এবার সেই ২০১১-র ‘পরিবর্তন’ স্লোগান ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ফিরে আসছে আর এক পরিবর্তনের দোসর হতে। বিহার নির্বাচনে বিজেপির তুমুল জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গেও অবধারিত ভাবেই ঘটতে চলেছে এক রাজনৈতিক পরিবর্তন।

সুজিত রায়

বিহার নির্বাচনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ফলাফল প্রকাশের অনেক আগে থেকেই সামগ্রিকভাবে সংবাদমাধ্যম (সীমিত কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্র ছাড়া) এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল দু'হাজার বিশে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের তরুণ ব্রিগেডের নেতা তেজস্বীর বিষে ফিনিশ হয়ে যাবেন রাজ্যের ১৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং সেই সঙ্গে নাভিশ্বাস উঠে যাবে তাঁর জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর। এবং হিন্দি বলয়ে বিজেপির পতনের ক্ষণের সূচনা হয়ে যাবে।

কিন্তু না। চূড়ান্ত আশাবাদীদের সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিয়ে, নিন্দুকদের সমস্ত নিন্দায় কালি মাখিয়ে দিয়ে বিহারে জিতে গেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স এবং ফের ষষ্ঠদশ সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন সেই নীতীশ কুমারই।

তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, তেজস্বী এবার নির্বাচনে কম তেজ দেখাননি। বিজেপি-সহ জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর ঘাড়ে শ্বাস ফেলতে ফেলতেই এগিয়েছে বহুদূর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকেও মেনে নিতে হয়েছে সিকন্দর বিজেপি-ই । কারণ যত ভোটেই হোক না কেন, বিহারের ক্ষমতায় এসেছে এনডিএ যার শরিক নীতীশ কুমারের জেডিইউ।

ফলাফলে যাঁরা আশাহত হয়েছেন বা যাঁদের চোখ টাটিয়েছে, বুক ফেটেছে ঈর্ষায়, তাঁরা ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছেন, বিহার নির্বাচনের ফলাফল বেশ জোরালোভাবেই ছাপ ফেলবে পশ্চিমবঙ্গের '২১-এর নির্বাচনে। অর্থাৎ এঁদের বক্তব্য হলো, এরাজ্যেও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস তেজস্বীর মতো তেজ দেখাবে। সেই তেজে জ্বলে পুড়ে যাবে নয়া শক্তিধর বিজেপি।

কতটা মিলতে পারে এই দুরাশা? একটু পর্যালোচনা করে নেওয়া যাক।

বিহারে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতটা কেমন ছিল?

১। পনেরো বছরের পুরনো সরকারের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র প্রশাসন বিরোধিতা।

২। নীতীশকুমারের আচমকা এনডিএ ত্যাগ এবং ফের ফিরে আসাটা মানুষের কাছে চিরাচরিত আয়ারাম গয়ারামের মতো নিকৃষ্ট রাজনীতি মনে হয়েছে।

৩। তেজস্বী যাদব রাজনীতির ময়দানে নতুন হলেও তিনি রাজ্যের একসময়ের একমেবাদ্বিতীয়ম্ লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র।

ভোটারদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে সেই মহাজন পূজনের ভক্তি এখনো রয়ে গিয়েছে।

৪। তেজস্বী যাদব তরুণ ও নবীন ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।

৫। তেজস্বী লড়াইয়ে যতটা সময় দিয়েছেন নীতীশের বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে ততটা নয়।

আর পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতটা কেমন?

১। দশ বছরের সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু লড়তে হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো সরকারের বিরোধিতার সমান বিরোধিতার সঙ্গেই।

২। তীব্র বিরোধিতার কারণ : (ক) প্রশাসনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে বেস ক্যাম্প পর্যন্ত বেহিসেবি দুর্নীতি, (খ) মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার ঝোঁক।

৩। দলীয় স্তরে চরমতম অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামাল দিতে নেতৃত্বের অপদার্থতা।

৪। কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই কেন্দ্রের বিরোধিতা করা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে রাজ্যে ঢুকতে না দেওয়া।

৫। মুসলমান তোষণের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে মুসলমানদেরই তৃণমূল বিরোধী হয়ে ওঠা।

৭। শিল্প স্থাপনে চরম ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করা।

৮। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখা।

৯। সরকারি সাহায্যের নামে হাজার হাজার থোক টাকা নয়-ছয় করা।

১০। ভাইপো ও ভাইদের প্রতি নেত্রীর ধৃতরাষ্ট্র-সম অন্ধ স্নেহ ও ভালোবাসা।

এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলিই প্রতিদিন শক্তিশালী হচ্ছে। আর যত তাই হচ্ছে, ততই পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে শাসক দল। প্রশান্ত কিশোরের নিয়োগ থেকে শুরু করে ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত দুর্নীতির প্রতি চোখ বুজে থাকার যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী তাতে দলের মধ্যে মুষলপর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ফলত, দল দুর্বল হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়।

দলীয় স্তরে গড়ে ওঠা এই জোরালো ফ্যাক্টরগুলি ছাড়াও প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে আরও কয়েকটি বাহ্যিক ফ্যাক্টর যা দল হিসেবে তৃণমূলের পক্ষে বেশ চিন্তার খোরাক। যেমন :

১। কংগ্রেস ও বামেদের নির্বাচন-পূর্ব জোটবন্ধন গড়ে ওঠা দুটি দলকেই শক্তি জোগাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কারণ, ভোটার হিসেবে যাঁরা এবার তৃণমূল বিরোধী এবং কোনো পরিস্থিতিতেই বিজেপিকে সমর্থন জোগাতে রাজি নন, তাঁরা এবার ঝুঁকবেন বাম অথবা কংগ্রেসের দিকে। শুধু তাই নয়, ওই দুই দল থেকে যাঁরা বিতৃষ্ণায় অথবা কিছু পাবার আশায় তৃণমূলে ভিড় জমিয়েছিলেন, তাঁরাও আশাহত হয়ে ফিরবেন তাঁদের মূল স্রোতেই।

বিহার নির্বাচনে মহাগঠবন্ধনের শরিক হয়ে বামেরা ২৯টি আসনে লড়াই করে ১৬টিতে জয়লাভ করেছে। সিপিআই (এমএল) একাই ১৯টি আসনে লড়ে ১২টিতে জয় পেয়েছে। সিপিআইএম লড়েছিল ৪টি আসনে। জিতেছে ২টিতে।

সিপিআই-ও ৬টি আসনে লড়াই করে ২টি আসনে জয় পেয়েছে। সব মিলিয়ে বিহারে বামেদের সাফল্য প্রায় ৮০ শতাংশ। উচ্ছ্বসিত সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি আশা করছেন ২০২১ থেকেই দলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বাম সমর্থকরা ফিরতে শুরু করবেন। এ হবে তাঁদের ঘরে ফেরার সূচনা।

একই ভাবনা কংগ্রেসেরও। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ভাঙতে শুরু করেছে। মুকুল রায়, সব্যসাচী দত্ত কিংবা অনুপম হাজরার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন বলে বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছেন চরমভাবে মমতার প্রতি বিরক্ত নেতারা। তৃণমূল যত ভাঙবে, কংগ্রেস ততই শক্তিশালী হবে বলে মনে করছেন রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব।

২। বিহার নির্বাচনে ওবেসির মজলিস-ই-ইত্তেমাদুল মুসলিমিন যা সংক্ষেপে মিম একটি তীব্র সংখ্যালঘু মৌলবাদী সংগঠন হিসেবেই পরিচিত, তারা জয়ের খাতা খুলে ফেলেছে। ২০টি আসনে লড়াই করে জিতে গিয়েছে ৫টি আসনে এবং এই সবকটি আসনই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চল। তৃণমূলের পক্ষে এই ইশারা সুখদায়ক নয়। ফলত দল চরম অস্বস্তিতে পড়েছে ওবেসির ঘোষণায়—'পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে অংশ নিতে আমাদের দল যথেষ্ট উৎসাহী।' এমনিতেই মুসলমান জনগণের একটা বড়ো অংশ তৃণমূল বিরোধী হয়ে উঠেছে। কারণ, তাঁরা বুঝে গেছেন, উন্নয়নের নামে মমতা তাদের হাতে কিছু বিনে পয়সার মোয়া তুলে দিয়েছেন, চাকরি দেননি। শিক্ষা দেননি। উলটে তাঁদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে প্রতি পদে। ফলে যদি ধরেই নেওয়া যায় এই তৃণমূল বিদ্বেষী সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট না-ও দেয়, তাহলে বোতাম টিপবে মিম-এর ঘরে। মিম নেতা ওবেসি সেই সুযোগটা ছাড়বেন না। থাবা পড়বে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে। এটা অবধারিত।

হিসেব মতো, পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বিহারের ২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলমান ভোটার এবারেও ছিল ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ। এই ভোটটা চিরকালই পেয়ে এসেছে হয় কংগ্রেস কিংবা আরজেডি। এবার মিম জিতেছে পাঁচটিতে কিন্তু লড়ে যাওয়া ২০ আসনের বাকি ১৫টিতে মিমের থেকে জোরালো থাবা বসিয়েছে, তা ফলাফলেই স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনেও বিহার ঘেঁষা আসনগুলিতে মিম তাকিয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। যদি বিজেপি ব্যর্থ হয়, তো সাফল্য পাবে মিম-ই।

তৃণমূলের কপালে ভাঁজ ফেলেছে সিপিআই (এমএল) দলও। অতিবাম বলে পরিচিত এই দলটি বিহারের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে জঙ্গল ঘেঁষা দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলিতে দলের নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য আজীবন সক্রিয়। সেই সক্রিয়তার ফসল এবার মিলেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের প্রসঙ্গ। শুনতে অদ্ভুত হলেও তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, বিজেপি-কে ঠেকাতে হলে সমস্ত বাম ও ডান শক্তিকে মহাজোট গঠন করে নির্বাচনে লড়তে হবে। অর্থাৎ সিপিআই (এমএল)-ও এ রাজ্যে আসন ভাগাভাগির শরিক হতে চাইছে। এটা তৃণমূল মানবে না, সিপিআইএম-ও মানবে না, এটা জেনেও প্রস্তাব দিয়েছেন দীপঙ্করবাবু এটা বোঝাতে যে এবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে তাঁর দলও ব্রাত্য হয়ে থাকবে না। অতিবাম শক্তির একটা বড়ো অংশের সমর্থনেই মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই সমর্থনে এবার থাবা বসাবে সিপিআই (এমএল) এটা স্পষ্ট।

এসবকেও ছাপিয়ে তৃণমূল চোখে অন্ধকার দেখছে পশ্চিমবঙ্গের এক অচেনা রূপ দেখে। প্রায় গোটা উত্তরবঙ্গ থেকেই ঘাসফুল উধাও। গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে গ্রাম শহর কোনো বাছবিচার না করেই। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেরুয়ার পাল্লা ভারী হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গেও। বিজেপির ভোট সেনাপতি অমিত শাহের ঘনঘন পশ্চিমবঙ্গ সফর বিজেপির আগামী সাফল্যকে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল করে তুলছে কোনো ম্যাজিকে নয়। কোনও জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় নয়। গত দশ বছর ধরে এক কোদাল এক কোদাল করে মাটি তুলতে তুলতে তৃণমূল নিজেই নিজের যে কবরটা খুঁড়ে ফেলেছে, অমিত শাহ আসছেন সেই কবরে শেষ কোদালের কোপ মেরে শেষবারের মাটিটকে তুলে আনতে। বিহারে তেজস্বীর নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিজেপিকে নাস্তানাবুদ করে দিতে নির্বাচনী প্রচারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তুলে। সেই প্রচারই শুইয়ে দিয়েছে মহাজোটকে। কারণ মানুষ স্বচক্ষে দেখেছেন, নীতীশকুমারের সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষও দেখবেন, একই ইস্যুতে বিজেপি শোয়াবে তৃণমূলকে। কারণ করোনা-প্রকোপ কমাতে গোটা দেশে যে রাজ্যগুলি সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গই তাদের মধ্যে প্রথম।

বিহার নির্বাচনের একটা বড়ো দিক ছিল, হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও নীতীশকুমারের দল ভাঙেনি, মন্ত্রীসভা ছেড়ে কেউ বেরোননি। কেউ আলাদা ভাবে আক্রমণ হানেননি মুখ্যমন্ত্রীকে। ফলে তেজস্বীর রাজনৈতিক পদক্ষেপে নীতীশের দলের আসনসংখ্যায় ধস নামলেও দল অটুট আছে। সরকারও তাঁরই হাতে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে তাঁর উল্টোটাই। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর রাজ্যের যাদব সম্প্রদায়ের মুষলপর্বেরই পুনর্নির্মাণ হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। শুধু শুভেন্দু অধিকারীই নয়, ঘাসফুল ঠেলে ফেলে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন অনেকেই। নেতৃত্বে তাঁরাই যারা এতকাল একজন সুবিধাবাদী, পারিবারিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয়কারিণী, অপরাজনৈতিক নারীর কাছে নিজেদের মানসম্মানকেও ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র 'পরিবর্তন'-এর জন্য।

এবার সেই ২০১১-র 'পরিবর্তন' স্লোগান ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ফিরে আসছে আর এক পরিবর্তনের দোসর হতে। বিহার নির্বাচনে বিজেপির তুমুল জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গেও অবধারিত ভাবেই ঘটতে চলেছে এক রাজনৈতিক পরিবর্তন যা মানুষকে ফিরিয়ে দেবে সুখ, শান্তি, দুর্নীতিমুক্ত এক প্রশাসন। মুক্তমনে নিঃশ্বাস নেওয়ার এক পরিবেশ। ▯

বিহারে মোদী-ম্যাজিক অটুট এবার গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ

রামানুজ গোস্বামী

সম্প্রতি বিহারে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সাম্প্রতিক অতিমারীর মধ্যে এতবড়ো একটি নির্বাচন সম্পন্ন করাটা নির্বাচন কমিশনের কাছে ছিল সত্যিই দারুণ এক চ্যালেঞ্জ। এটা তো জানাই ছিল যে, ভোটগ্রহণ পর্বে যদি বিন্দুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হতো, তবে বিরোধীরা কমিশনকে একেবারে তুলোধোনা করত। তাছাড়া, এই অতিমারীর মধ্যে কীভাবে ভোট সম্ভব (তাও আবার এত জনবহুল স্থানে), তা নিয়ে চিন্তিত ছিল অনেকেই। ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও ওঠে নানা মহল থেকে। কিন্তু ভারতের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিষয়টি পরিচালনা করেছেন এবং বিহারবাসীও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই কোনও হিংসাত্মক ঘটনা, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন ইত্যাদি ছাড়াই নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে।

এবারে সরাসরি আসা যাক নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে। বিহার নির্বাচনে এনডিএ জোট পেয়েছে ১২৫টি আসন এবং প্রধান বিরোধী প্রতিপক্ষ 'মহাগঠবন্ধন' পেয়েছে ১১০টি আসন। লক্ষণীয় যে, এই ১২৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পেয়েছে ৭৪টি আসন। অন্যদিকে বিজেপির শরিক নীতীশকুমারের দল জেডিইউ পেয়েছেন মাত্র ৪৩টি আসন, যা গত বিহার নির্বাচনের থেকে বেশ কম। কিন্তু বিজেপি বিহারের গত বিধানসভা নির্বাচনে যা আসন পেয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি আসন পেয়েছে। ফলে একটা প্রশ্ন উঠেই যায়, লোকে কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখেই ভোট দিয়েছে? ঘুরিয়ে বললে এভাবেও বলা যায় যে, নীতীশকুমারের প্রতি বিরক্ত হয়েই কি বিহারবাসী এই ভোটদান করেছে? এক্ষেত্রে, গোড়াতেই যে কথাটি বলে রাখা ভালো, তা এই যে, নরেন্দ্র মোদী হলেন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা বা রাষ্ট্রনায়ক। ভারতবাসী যে তাঁর প্রতি কতটা আস্থা রাখেন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনেই। তাছাড়া, যে কোনও রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনিই হয়ে ওঠেন একচ্ছত্র নেতা। বলাই বাহুল্য যে, মোদীজীর ব্যক্তিত্ব, সততা, দেশের তথা বিহারের প্রতি দায়বদ্ধতা, উদারতা, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ প্রভৃতি কারণেই বিহারবাসী মোদীজীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে জয়যুক্ত করেছে। আরজেডি-র তেজস্বী যাদব যতই বিরোধীদের নেতা বলে স্বীকৃত হোন না কেন, গত লোকসভা নির্বাচন ও এক্ষেত্রে বিহার নির্বাচনের ফলাফলেই এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, দেশে ভোট দেয় মানুষ

একজনকে দেখেই, তিনি আর অন্য কেউ নন— তিনি হলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী।

অনেকেই একথা ভেবেছিলেন যে, এবারে হয়তো বিজেপি বিহারে দারুণ ফলাফল করতে পারবে না। তাছাড়া, কংগ্রেসের বিষয়েও অনেকের আস্থা ছিল। বস্তুত এই সকল ব্যক্তি এটা ভুলে গিয়ে ছিলেন যে, যাদবরাজকে (যাকে অনেকে জঙ্গলরাজও বলেন) ফিরিয়ে আনার কোনও ইচ্ছাই আর বিহারবাসীর নেই। তাছাড়া, পরিবারবাদকে বিহারে জায়গা দিতে বিহারবাসী একেবারেই রাজি নয়। বর্তমান বিহার, দুর্নীতিমুক্ত, অপরাধ মুক্ত এক নতুন বিহার। এই বিহারে ভোটের সময় শাসকদল সন্ত্রাস দেখায় না, এই বিহারে নারীরা সম্পূর্ণ ভাবেই সুরক্ষিত, এই বিহারে তরুণ সমাজ এক উদ্দীপনায় এগিয়ে যায় এবং দেশ ও জাতিকে পথ দেখায়। তাই ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১৯টি আসন। যে সকল ব্যক্তি গান্ধী-পরিবারের প্রতি দারুণ আনুগত্য প্রদর্শন করেন, সেই সকল ব্যক্তির উচিত রাহুল গান্ধীর প্রতি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যে সকল মন্তব্য করেছেন (অপরিণত ইতাদি) সেগুলি পড়ে দেখা। মনে রাখতে হবে যে, এই যুগ হলো নতুন ভারতের যুগ। তাই যে সকল ব্যক্তি ভেবেছিলেন যে, বিহারের তরুণ প্রজন্ম ও মহিলারা ভোট দেবেন এনডিএ-র বিরুদ্ধে, সেই সকল ব্যক্তির ভাবনা ভুল প্রতিপন্ন করে, মিথ্যা তথা অপপ্রচারকারীদের কুৎসায় ভ্রূক্ষেপও না করে বিহারবাসী আবারও এনডিএ-কেই জয়ী করেছেন।

সম্প্রতি বিহারে যে সব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তার মধ্যে দু'একটির কথা এখানে উল্লেখ করব। প্রথমটি হলো অবশ্যই মহিলা ভোটের শতকরা হিসাব, যেখানে পুরুষ ভোটারের পরিমাণ হয়েছে শতকরা ৫৪.৭ শতাংশ, সেখানে মহিলা ভোটারের পরিমাণ শতকরা ৬০ শতাংশ। সুতরাং বোঝাই যায় যে, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করেছে, এটি তারই সুফল। এই বিপুল মহিলা ভোটের অধিকাংশই যে এনডিএ পেয়েছে, তা তো বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, জঙ্গলরাজ ফিরিয়ে আনা বা দুর্নীতিকে পুনরায় প্রশ্রয় দিতে বিহারবাসী আর যে রাজি নন, সেকথা তো আগেই বলেছি। এছাড়া তরুণ প্রজন্মের আস্থাও একটা খুব বড়ো বিষয়। তরুণ বা যুবসমাজ যে মোদীজীর প্রতিই আস্থা রাখেন, সেটাও এই ভোটের আরও একটি দেখবার মতো বিষয়।

উল্লেখ্য যে, ভারত সরকার এই অতিমারীর মোকাবিলায় যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছে, সেগুলি যথাযথ কিনা বা তাতে মানুষের ভরসা আছে কিনা, সেটাও একটা দেখবার বিষয় ছিল। এতেও এনডিএ দারুণ ভাবে সফল হয়েছে। শুধুমাত্র বিহারেই নয়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, মণিপুর, গুজরাট— সর্বত্রই আজ বিজেপির জয়ধ্বজা উড্ডীয়মান। এর কারণ একটিই, তা হলো দেশ ও দেশবাসীর প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা

ও সুশাসন। দেশকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিজেপি বদ্ধপরিকর।

এবারে পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায় আসা যাক। এই রাজ্যে নির্বাচন হবে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুর্দান্ত ফলাফল করেছে বিজেপি। আগামী বছরের নির্বাচনের জন্য বহুদিন আগে থেকেই বিজেপি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি এই রাজ্যে এসেছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এটা বেশ ভালো ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী বছরের নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবার জন্য বিজেপি প্রস্তুত। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, বিহার-সহ এতগুলি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে এটা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, সমস্ত রাজ্যের মানুষই আজ বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টিকেই চায়। পশ্চিমবঙ্গও যে তার ব্যতিক্রম নয়, সে তো গত বছর লোকসভা নির্বাচনেই বোঝা গিয়েছে। বেকারত্ব, নারী নির্যাতন, নানাবিধ দুর্নীতি এবং অবশেষে অতিমারীর ক্ষেত্রেও অনমনীয় মনোভাব দেখানো, স্বাস্থ্য-পরিষেবায় এত পিছিয়ে থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী বর্তমান সরকারের প্রতি নানাভাবে বিরূপ হয়েছেন। তারই কারণে এই রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা একটা খুব বড়ো বিষয়। অতিমারী বা পরবর্তী সময়ে তা আরও বেড়ে গিয়েছে। এখানকার মানুষদের দূরবর্তী রাজ্যগুলিতে যেতে হয় জীবিকার সন্ধানে, কারণ এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশই নেই। শিক্ষিত বেকারও এই রাজ্যের একটা খুব বড়ো সমস্যা। তাই গবেষণা করা ছাত্র-ছাত্রীদেরও সামান্য এইট পাশ বা মাধ্যমিক মানের চাকরির জন্য এই রাজ্যে আবেদন করতে দেখা যায়। ভারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও এই রাজ্য বিশেষ কোনও বড়ো শিল্পায়নের সম্মুখীন হয়নি এই সরকারের আমলে। তাছাড়া, আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতিই যথেষ্টই উদ্বেগের

বিহার নির্বাচনে এন ডি এ-র সাফল্যের কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য। মহিলা ভোটারের শতকরা ৬০ শতাংশ ভোট এন ডি এ পেয়েছে। জঙ্গলরাজ ফিরিয়ে আনা বা দুর্নীতিকে পুনরায় প্রশ্রয় দিতে বিহারবাসী আর রাজি নন। তরুণ বা যুবসমাজ যে মোদীজীর প্রতিই আস্থা রাখেন, সেটাও প্রমাণিত হয়েছে।

কারণ, যা নিয়ে রাজ্য-সরকারকে বারে বারে সতর্ক করেছেন স্বয়ং মহামহিম রাজ্যপালও, কিন্তু রাজ্য-প্রশাসন এই ব্যাপারে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ না করে উলটে রাজ্যপালেরই সমালোচনা করেছে। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে আরও একটি উদ্বেগের কারণ হলো, এই রাজ্য থেকে একের পর এক জেহাদি জঙ্গিদের ধরা পড়া। নিঃসন্দেহে এটি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভারত তথা সারা বিশ্বের কাছে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির সংস্কৃতির মানও ক্রমেই হয়ে চলেছে নিম্নমুখী। সম্প্রতি বসন্ত-উৎসবের নামে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অশ্লীল কাণ্ড ঘটেছিল বা কয়েক মাস আগেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে যে বর্বরতা ঘটানো হয়েছিল, তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে অপসংস্কৃতি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। এই সব নানা কারণেই বাঙ্গালির মধ্যে আবারও এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

এই রাজ্যের ভোটে শাসকদলের সন্ত্রাস যে কেমন হয়, তা সকলেরই জানা। এই বিষয়ে তাই নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট বিবেচনা করে পদক্ষেপ করতে হবে। তবেই অবাধে নির্বাচন সম্ভব হবে। বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির এখন অনেক দায়িত্ব। দলকে আরও সংগঠিত করে তুলতে হবে। আত্মতুষ্ট না হয়ে কাজ করে যেতে হবে। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে হবে— হতে হবে জনগণের ঘরের লোক। বিহার নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে আশার সঞ্চার করেছে। তাই উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। ভারত সরকারের জনমুখী কল্যাণকর প্রকল্পগুলির সঙ্গে জনগণকে আরও বেশি করে সচেতন করে তুলতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। তবেই সফলতা লাভ করা যায়। বিহার নির্বাচনের ফলাফল সেই কথারই প্রমাণ দিয়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বিহার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বঙ্গ রাজনীতির সম্ভাব্য নতুন সমীকরণ

ড. তরুণ মজুমদার

সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বামেদের প্রধান শত্রু কিন্তু দক্ষিণপন্থী শক্তি নয় বরং বরাবরই তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো-না-কোনো বাম শক্তি। বামেদের উপর আঘাত এনেছে অতি-বামেরাই। রাশিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ কিংবা লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশ যেখানেই কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, তাদের প্রতিস্পর্ধীদের হয়ে উঠে এসেছে কোনো অতিবাম সংগঠন। আমাদের রাজ্যেও এই ঘটনা বারংবার ঘটেছে। বিগত শতকের সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন চলার সময় এই অতিবাম শক্তির সঙ্গে একটার পর একটা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে সিপিআইএম, সিপিআই-সহ অন্য বাম দলগুলি। 'শত্রুর শত্রু বন্ধু'— এই তত্ত্ব মেনে প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গেও ক্ষেত্রবিশেষে আঁতাত করতে দেখা গেছে নকশালপন্থীদের। এ রাজ্যে বাম জমানার একদম শেষের দিকে বাম ও অতিবামের এই আত্মঘাতী লড়াইয়ের সার্থক নজির আমরা দেখেছি জঙ্গলমহলে সিপিআইএম এবং মাওবাদীদের রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। সত্তরের দশকে নকশাল ও কংগ্রেসের মধ্যে যে অশুভ আঁতাত রাজ্যবাসী দেখেছিলেন, একই রকম আঁতাত তারা মাওবাদীদের সঙ্গে তৃণমূলের মধ্যে দেখছেন। এমনকী তৎকালীন মাও নেতৃত্ব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চেয়ে বিবৃতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। পরবর্তী বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস আর নাই বা লিখলাম। মাত্র কিছুদিন আগে, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের পরবর্তী সময়ে রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন ভাঙড়ের পাওয়ার গ্রিড আন্দোলনের ক্ষেত্রে সিপিআইএম ও নকশালদের মধ্যে আন্দোলনের রাশ হাতে নেওয়া নিয়ে চরম বিরোধিতা। এই রাজনৈতিক ইতিহাসগুলি চোখে আঙুল দিয়ে বারংবার একটা বিশেষ দিকেই ইঙ্গিত করে; তা হলো এভাবেই চিরটা কাল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য অতিবাম শক্তি দক্ষিণপন্থী শক্তিকে সমর্থন জুগিয়ে চলেছে। ঠিক একইভাবে এদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মেকি দক্ষিণপন্থা এবং জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থার লড়াইয়ে বামেরা সর্বদাই প্রথম গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত করে তোষণবাদী রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হতে চেয়েছে।

একদিকে তোষণবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব ও সীমাহীন দুর্নীতি এবং অপরদিকে জনমানসে ক্রমশ উত্থিত জাতীয়তাবোধ— এই জোড়া ফলায় বিদ্ধ হয়ে যখন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম, ঠিক তখনই বিহার নির্বাচনে আমরা দেখলাম বামেরা অতি-বামপন্থীদের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে তোষণবাদী মেকি দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একত্রে রাজনৈতিক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করলো। লক্ষ্য একটাই— তোষণবাদী মেকি দক্ষিণপন্থার সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থার এই ধর্মযুদ্ধে প্রথমোক্ত গোষ্ঠীকে সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ মুখোশ খুলে পড়া তোষণবাদী রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত বিকৃত ন্যারেটিভের মাধ্যমে তাকে আবার জনমানসের সামনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

বিহার মডেলকে সামনে রেখেই কি মেকি তোষণবাদী দক্ষিণপন্থী শক্তি এ রাজ্যে ২০২১-এর নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে? তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের করা মন্তব্য— 'বিহারের বামনেতা ঠিকই বলেছেন'— সেদিকেই তো ইঙ্গিত করে। প্রসঙ্গত বিহার নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সিপিআইএমএলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে তৃণমূল নয় বরং বামেদের এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে প্রধান প্রতিপক্ষ ধরে এগোনো উচিত। অর্থাৎ ইঙ্গিত পরিষ্কার। রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাম ও অতি বামেদের যৌথ মঞ্চ গঠনের ইঙ্গিত। এভাবেই জিহাদীদের সঙ্গে আপোষ করা দক্ষিণপন্থী রাজনীতির হাতে জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির পরাজয়ের নীল নকশা তৈরি করার গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এ রাজ্যের বুকে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

জাতীয় রাজনীতিতে আক্ষরিক অর্থেই নোটার সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে ম্রিয়মাণ বামেরা সর্বতোভাবে জনসাধারণ থেকে সহস্র যোজন দূরে চলে গিয়ে রাজনীতির আঙিনায় সম্মুখ সমরের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নতুন করে ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে উঠতে চাইছেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কৌশলকে নতুন মোড়ক দিয়ে সমাজ জীবনে নিজেদের বিকৃত আদ্যন্ত বস্তুবাদী দর্শনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার মরিয়া তাগিদ থেকে পরোক্ষভাবে তোষণবাদী মেকি দক্ষিণপন্থীদের সহায়তা করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে চাওয়াটা বামেদের রাজনৈতিক চালাকি হতেই পারে কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে তা আবশ্যিকভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধের ধর্ষণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বেদান্ত নির্দেশিত সমাজবাদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একাত্ম মানব দর্শনকে পাথেয় করে

এগিয়ে চলা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারিগরেরা ঘটে চলা এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে কীভাবে পরাস্ত করবেন সেদিকে এ রাজ্যের রাজনীতি সচেতন প্রতিটি নাগরিকই চেয়ে আছেন।

বিহার নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো আসাউদ্দিন ওয়াইসির মিম নামক রাজনৈতিক দলটির অচিন্ত্যনীয় সাফল্য। হায়দরাবাদের ছোট্ট একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের জাতীয় রাজনীতিতে এই অভূতপূর্ব সাফল্য স্বাভাবিক কারণেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বস্তুত মিমের এই নজরকাড়া সাফল্যের দায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বর্তায় তোষণবাজ ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর উপর। দশকের পর দশক ধরে শুধুমাত্র ভোটের জন্য নির্লজ্জ তোষণ মুসলমান সমাজকে আধুনিকতা থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে রেখে জেহাদের কানাগলিতে প্রবেশ করিয়েছে, আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে তারা মসজিদ ও মাদ্রাসার জালে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী তোষণবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলির জায়গা ক্রমশ দখল করে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতার ফসল ঘরে তুলছে এআইএমআইএম (মিম)। এই প্রবণতা এ রাজ্যে প্রথম নয়। এর আগে এই রাজ্যের বুকে ১৯৬৯ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লিগ নামে একটি দল ৪০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে তিনটিতে জিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণরূপেই আলাদা। বিগত কয়েক বছরে এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেভাবে একের পর এক জিহাদী জঙ্গি এনআইএ কর্তৃক গ্রেপ্তার হচ্ছে, যেভাবে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়ার ষড়যন্ত্র চলছে, যেভাবে তোষণের মাত্রা নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে— সেই প্রেক্ষিতে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির রাজ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিপদজনক বার্তা বহন করে।

ইতিমধ্যে এ রাজ্যে মিম-এর সদস্য সংখ্যা কুড়ি লক্ষ অতিক্রান্ত। আসাউদ্দিন ওয়াইসির ছবি দিয়ে ব্যানার ফেস্টুন তৈরি করে জেলায় জেলায় প্রচার চলছে। ছবির নীচে লেখা 'ইন্তেজার আব খতম, মিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল'। শোনা যাচ্ছে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মিম কমবেশি ১০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ রাজ্যে প্রায় ৭৮ থেকে ৮০টি বিধানসভা আসনের ক্ষেত্রে মুসলমান ভোটারেরা নির্বাচনী ফলাফলের নির্ণায়ক শক্তি। মিমের দাবি, এরকম প্রায় ৫০টি আসনে তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। রাজ্যের বর্তমান নিদারুণ পরিস্থিতির বাস্তবিক পরিপ্রেক্ষিতে মিম যদি তাদের দাবির মাত্র কুড়ি শতাংশও অর্জন করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তারা যদি দশটি বিধানসভা আসনও জিততে পারে এবং একইসঙ্গে রাজ্যে যদি ত্রিশঙ্কু বিধানসভার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে বাঙ্গালি হিন্দুদের স্বাধীন ভাবে শ্বাস নেওয়ার শেষ আশ্রয়স্থলটুকুও অচিরেই আরব সাম্রাজ্যবাদের পদানত হবে। ধর্মান্ধ জিহাদী শক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী নির্লজ্জ তোষণবাদী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে প্রচণ্ড মৌলবাদের প্রতিযোগিতা এবং সক্রিয় আগ্রাসন শুরু হবে তাতে আবারও একবার ভিটেমাটি চ্যুত হওয়াটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। []

আবার উন্নয়নের পক্ষেই সওয়াল বিহারের জনতার

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

অসামান্য রাজনৈতিক পরিণতমনস্কতার পরিচয় দিলেন বিহারবাসী। বিগত শতাব্দীর ৮ ও ৯-এর দশকেও বিহারের রাজনীতি আবর্তিত হতো জাতপাত ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সমীকরণের উপর। সেই সুযোগে বিহারে একাধিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল যারা এই জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে ক্ষমতায় টিকে থাকত। ওই দলগুলির অধিকাংশই ছিল পরিবার ভিত্তিক রাজনৈতিক দল যারা দল ও প্রশাসনের উচ্চপদে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের বসিয়ে ক্ষমতার রাশ নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখত। এই সুযোগে সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বেড়াজালে নিমজ্জিত হয়েছিল এই রাজ্যটি। প্রশাসকদের শিক্ষাগত অযোগ্যতা ও প্রশাসনিক অদক্ষতার জন্যে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা দিয়েছিল। অপরাধ জগতের বাড়বাড়ন্তে জঙ্গলরাজ স্থাপিত হয়েছিল বিহারে। এবং উন্নয়নের মাপকাঠিতে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় শেষ সারিতে চলে গিয়েছিল বিহার।

রাজ্যের ইতিহাসে নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এনডিএ সরকারের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এই অধ্যায় বিহারে রাজনীতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কারণ এই সময়েই পিছনের সারিতে চলে যাওয়া রাজ্যটিতে উন্নয়নের রাজনীতি ফিরে আসে। রোটি-কাপড়া-মোকান, বিজলি-পানি- সড়কের রাজনীতি বিহারে আসে সুশীল মোদী ও নীতীশ কুমারের হাত ধরে। বিজেপির মতাদর্শগত রাজনীতি বিহারের জনতাকে এক নতুন ভোরের সন্ধান দেয়। আইন-শৃঙ্খলায় লক্ষণীয় উন্নতি হয়। কর্মসংস্থান, কৃষি, শিল্প, শিক্ষার উন্নয়ন— সেই মতাদর্শগত রাজনীতির প্রতিফলন। আর এটা শুধু মুখের কথা নয়, বিগত বছরগুলির পরিসংখ্যান দেখলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয় যে এনডিএ-এর শাসনকালে বিহারে গার্হস্থ হিংসা লক্ষণীয়ভাবে কমেছে, অপরাধের ঘটনা আগের থেকে অনেক কমেছে ও উন্নয়নের মাপকাঠিতে বিহার প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যে অবস্থান করছে।

২০২০-র বিহার বিধানসভার ফলাফল মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি ও তথাকথিত 'টুকড়ে- টুকড়ে গ্যাং' ও এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের কাছে বড়ো ধাক্কা। যাদের প্রত্যহ বিজেপি, আরএসএসের মুণ্ডপাত না করলে রাত্রে শয়নকক্ষে নিদ্রা আসে না, যারা 'সব কা সাথ,সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস' নীতির পরিবর্তে বিহারে জঙ্গলরাজ ফেরত আনার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, তারা আজ চরম হতাশ। কারণ বিহারের জাতীয়তাবাদী সচেতন নাগরিক তাদের সেই স্বপ্ন পূর্ণ হতে দেয়নি। উল্লেখ্য, বিহার বিধানসভার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৫৯ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছিল, তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৪১টি। শতাংশের বিচারে যা প্রায় ৭০ শতাংশ। এই বিপুল জয় প্রমাণ করে ২০-র দশক সুশাসনের, উন্নয়নের, সৎ রাজনীতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের।

বিজেপি সবসময় মতাদর্শের রাজনীতি করে এসেছে। দলের অনেক দুর্দিন এসেছে, কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলা ও মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে দল সেই কাঠিন্য কাটিয়ে আবার সাফল্যের মুখ দেখেছে। দল কখনও নীতি ও আদর্শচ্যুত হয়নি। তার বড়ো প্রমাণ এবারে বিহারে জেডিইউ-এর তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন। জনতার আশীর্বাদে বিজেপি আজ জোটের সবথেকে বড়ো দল। এনডিএ জোটে বিজেপি-র থেকে প্রায় অর্ধেক আসন কম পাওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, জেডিইউ-এর নীতীশ কুমারকেই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। বড়ো দল হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি কথার খেলাপ করেনি। তাই বিজেপি আজকে 'A Party with Difference'— পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল। ভারতের শতাব্দী প্রাচীন নীতিহীন রাজনৈতিক শক্তি আজ শুধুই একটি প্রান্তিক শক্তি। কারণ দেশের মানুষ আজ বুঝেছেন 'গেরুয়াই ভরসা'। □

পশ্চিমবঙ্গে শক্ত ভিত গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে ওয়েসির

বিশ্বপ্রিয় দাস

মাত্র একটা আসন, তাও আবার হায়দরাবাদের পুরনিগমের। সেই থেকে একটি আঞ্চলিক দলের জন্ম। দেখতে দেখতে সেই দলের বয়েস ৯৩। সেই দল বিহার নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার পর পরই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এর কারণ আমাদের রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক। এই ভোটব্যাঙ্ক হচ্ছে রাজ্যের ভোট নামক বিষয়ে নীতি নির্ধারক একটি বিষয়। রাজ্যের সমস্ত ভোটের ২৯ থেকে ৩০ শতাংশ ভোটের অংশীদার এই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক।

বিহারে আসাদ্দুদ্দিন ওয়েসির মিমের সাফল্য আসার পরেই তাকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। ওয়েসি নিজেও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে অংশ নিতে চান বলে জল্পনা উসকে দিয়েছেন।

রাজ্যের শাসক দলের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি জেলায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল স্পষ্ট। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলী, হাওড়া এই রকম কয়েকটি জেলা। আর আছে বাংলাদেশ লাগোয়া জেলাগুলি। এই সব জেলায় যেমন সংখ্যালঘু ভোটের একটি বৃহৎ অংশ বর্তমানে শাসক দলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তেমনি তারা বিকল্প হিসেবে বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। ২০১১ সালের নিরিখে নির্বাচনী ইস্তাহারের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানে স্পষ্ট ভাবে লেখা হয়েছিল, সংখ্যালঘু স্বার্থ সুরক্ষিত হবে, এই স্বার্থ হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক। আর সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করবে। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব ছিল সেই নির্বাচনী ইস্তাহারে। কিন্তু পরবর্তী ৯ বছরে সংখ্যালঘুদের কপালে শুধু বঞ্চনাই জুটেছে। সেই ইস্তাহারে বিশেষ দপ্তর গঠন করা থেকে শুরু করে প্রশাসনে বেশি করে সুযোগ দেওয়া, এবং সব রকম উন্নয়নের কথাও ফলাও করে বলা হয়েছিল, বলা হয়েছিল কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্ব দেবার কথাও। সেসব

দিন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকদল ভুলে গেছে সেই সব প্রতিশ্রুতির কথাও। এই কারণেই সংখ্যালঘুদের ভোট পাবার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

এবার তাকানো যাক, ওই ৩০ শতাংশ ভোটব্যাঙ্কের মধ্যে, কীভাবে নির্ধারিত হয় ভোট ভাগাভাগির অঙ্ক।

এই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের মধ্যে আছেন এমন একটি সম্প্রদায়, যারা একটু শিক্ষিত। তারা খুব ভেবেচিন্তে নির্বাচনে কাকে ভোট দেবেন, সেটা ঠিক করেন। ২০২০-র নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, রাজ্যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ রাজনৈতিক দলগুলির মাথার ওপর নেমে এসেছে এই শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়াতে। শিক্ষার হার বাড়াটা সরকারের কৃতিত্ব নয়, পায়ের নীচে জমি খুঁজতে সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হওয়াই এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ। আজকের দিনে আধুনিকতার যে ধারা চলছে, সেই ধারার সঙ্গে মিশে যাবার ইচ্ছাতেই শিক্ষা গ্রহণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। চাকরি থেকে পেশাদারি জগতে প্রবেশের হাতছানিটাও তাঁদের আকৃষ্ট করেছে আরো বেশি করে শিক্ষা লাভের। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্প এই সব শিক্ষিত যুবকদের উৎসাহিত করেছে আরো বেশি করে। একদিকে রাজ্য সরকারের তরফে দীর্ঘমেয়াদি একটা অবহেলা, অন্যদিকে নিজেদেরকে সমাজের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আজকের সংখ্যালঘু যুবসমাজ রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে অনেক বেশি ভাবে সচেতন। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই যুব ভোটারদের একটা বৃহৎ অংশ ভোটে অংশ নেবে। সেটা যে শাসক দলের পক্ষে খুব একটা সুখকর হবে না, এটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার। এবার আসা যাক, যারা একটু শিক্ষার জগতের বাইরে তাদের কথায়। তাঁদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করবে এই শিক্ষিত যুবক ও যুবতীদের বিষয়টা। ফলে একটা সাঁড়াশি আক্রমণের মধ্যে পড়তে হবে শাসকদলকে। বাম আমলে ৩৪ বছরের বঞ্চনা ও তার পরবর্তী ১০ বছরের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার দায় নিতে হবে বর্তমান শাসকদলকেই ।

এবার ফিরে আসা যাক ওয়েসির প্রভাব কতটা পড়তে পারে সেই প্রশ্নে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক পড়ল। যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এখানে নতুন কোনো রাজনৈতিক দল যদি এসে নির্বাচনে অংশ নেয়, সেক্ষেত্রে সে যতই ভালো কথা বা প্রস্তাব দিক না কেন, তাঁদের নিজেদের আলাদা কোনো রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি হয় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয়, সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল, সেক্ষেত্রেও ভোট কাটাকাটির অঙ্কে, শাসক দলের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হবে না। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজ্যের শাসক দল, কংগ্রেস ও রাজ্যের বামদলগুলি।

এ রাজ্যে ওয়েসির মিম সীমান্ত অঞ্চলে সামান্য প্রভাব হয়তো ফেলতে পারে। অন্তত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সেরকমটাই ধারণা। নির্বাচনের মাস ছয়েকের মতো বাকি। সেই সময়ে মিম কতটা ঘর গুছিয়ে, সাংগঠনিক ভাবে নিজেদেরকে তুলে ধরবে বা ধরতে পারবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এই রাজ্যের শাসক নির্ধারক ওই ২৯ থেকে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য সবার। সবাই ঘুঁটি সাজাচ্ছে সেই ভাবেই। ফলে মিম যদি মনে করে ফাঁকা মাঠে গোল দেবার, তবে সেক্ষেত্রে গুড়ে কিচ কিচে বালির চেহারা নেবে তাঁদের সেই প্রত্যাশা। তাই ওয়েসির পশ্চিমবঙ্গে শক্ত ভিতের দিবাস্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে বলা যায়।

জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের তফাতটা বাঙ্গালিকে ধরতে হবে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয় গুণে, তাঁর রাজনৈতিক মতের জন্য নন। তাঁর অভিনয়-দক্ষতায় সকল বাঙ্গালি মুগ্ধ। একে কাজে লাগিয়ে ভারত থেকে বিলীয়মান একটি রাজনৈতিক মতকে যদি কেউ ভাবেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাহলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়টির আপাতদৃষ্টিতে কোনও সেভাবে যোগ নেই। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিষয়টির প্রবণতা বুঝতে ঘটনাটিকে হালকা করে নেওয়া যাবে না। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর মৃত্যু চলচ্চিত্র জগতের নিকট অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি এতটা বয়সেও (মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর) সিনেমায় তাঁর অভিনয়-দক্ষতা দিয়ে যথেষ্ট কর্মক্ষম ছিলেন। সেইজন্য তাঁর চলে যাওয়াটা চলচ্চিত্র-প্রেমী মানুষের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। আরও একটা বিষয়, তিনি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মত ও পথের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। সেই সূত্র ধরেই একাধিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল। তবুও কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি কোনোদিন তাঁর প্রতি অসম্মান দেখায়নি। বিজেপির এক কেন্দ্রীয় নেতা তাঁর সঙ্গে আলাদা করে দেখাও করেছিলেন, সৌজন্যও দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনা প্রকাশ্যেও এসেছিল ভিডিয়োর মাধ্যমে। তিনি মারা যাবার পর দেখা গেল, তিনি কবে কোথায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কী সমালোচনা করেছেন, কোন ইস্যুতে পথে নেমেছেন, এসবই সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি সমর্থকরাও নেমে পড়লেন পালটা জবাব দিতে। তাঁদের বক্তব্যে আসল যে কথাটা উঠে এল তা হলো অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। সেই সূত্রেই কেন্দ্রের শাসকদলের বিরোধিতা করাটা তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যেই পড়ে। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক মত নিরপেক্ষ ছিল না, তাঁকে এ ব্যাপারে ধ্রুব সত্য বা ভগবান মনে করারও কোনও কারণ নেই। আর যাই হোক, এই সুঅভিনেতাকে বিবেকানন্দ, কী বঙ্কিমের মতো প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক ভাববারও কোনও কারণ নেই।

আজ বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের নামে যা হচ্ছে, সেটা আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদ। বাঙ্গালির জাতীয়তাবাদে ভারতের অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি সম্মান থাকে, পরভাষা-বিদ্বেষ নয়। তাতে ভারতীয়ত্ব ও শিকড়ের প্রতি গভীর মমত্ব থাকে, শিকড় উপড়ে ফেলার ধ্যাস্টামো নয়।

অত্যন্ত সঙ্গত যুক্তি। অভিনেতা হিসেবে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তী হতে পারেন। তাতে করে তাঁর রাজনৈতিক মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। বরং তিনি যে রাজনৈতিক মতের অনুগামী তা সারা পৃথিবীতেই, ভারতেও নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। আমরা অতীতেও দেখেছি, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় তিনি তৎকালীন রাজ্যের শাসক দলের রক্তমাখা হাতের সমর্থনে কথা বলেছিলেন। যে কারণে রাজ্যের মানুষ তাঁর ওপর অসন্তুষ্টও হয়েছিল, তাঁর বাড়ির সামনে একটি মিছিলে তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগানও ওঠে; আরও যেসব বিষয় হয়েছিল আজকের দিনে সেই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে আর চাই না। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয় গুণে, তাঁর রাজনৈতিক মতের জন্য নন। তাঁর অভিনয়-দক্ষতায় সকল বাঙ্গালি মুগ্ধ। একে কাজে লাগিয়ে ভারত থেকে বিলীয়মান একটি রাজনৈতিক মতকে যদি কেউ ভাবেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাহলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তাঁর হনুমান চল্লিশার বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন করাও বুঝিয়ে দেয় অর্থের কাছে তাঁর সেই রাজনৈতিক

আদর্শ বিক্রয়-যোগ্য। খবরে প্রকাশ, এইসব অপ্রিয় প্রসঙ্গগুলি উঠে আসায় তাঁর কন্যা যারপরনাই বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর বোঝা উচিত, সুযোগ-সন্ধানী কমিউনিস্ট-নির্মিত কাঁচের ঘরে বসে ঢিল না ছোঁড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবার আসল কথায় আসি। আসলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহটাকে ঘিরে একটা ঘৃণ্য রাজনীতি চলল। চলল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে 'আন্তর্জাতিক বাঙ্গালি' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তার আড়ালে উগ্র বিজেপি-বিরোধিতা, বিজেপিকে বাঙ্গালি-বিরোধী হিসেবে দেখিয়ে বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভেদ তৈরি করা; সর্বোপরি দুই বাঙ্গলার বাঙ্গালি এক হয়ে 'বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদে'র খোয়াব দেখানো। এই প্রবণতা নতুন নয়, আমরা এই রাজ্যের শাসক-গোষ্ঠীর তরফে একটি সংগঠনকে সামনে রেখে এই ঘটনা আগেও অজস্রবার দেখেছি, এখনও অহরহ দেখছি। নকশালগোষ্ঠী যে সেই 'পক্ষ' নামধারী সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাও সকলের জানা। কিন্তু এবারের পরিস্থিতিটা '৪৬-এর দাঙ্গার ঘটনার স্মৃতি উস্কে দেবে। এজন্য শুধু মাওবাদীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, ভারতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পথাবলম্বী কমিউনিস্টরাও যে পথে নেমে পড়েছে তাদের স্বাভাবিক দোসর মুসলিম লিগকে সঙ্গে নিয়ে তা বোঝা যায়।

উপলক্ষ্য শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পালন। সেই মুজিবুর রহমান যিনি '৪৬-এর 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামক হিন্দু নিধন যজ্ঞে মুসলিম লিগ নেতা ও বঙ্গপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হুসেন সৈয়দ সুরাবর্দির অন্যতম সহযোগী ছিলেন। কলকাতায় মুসলমান সম্প্রদায়িকতা প্রচার ও প্রসারে মুজিবুরের ভূমিকা এখন আলোচিত হওয়া উচিত, তা না হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলে চালানো হচ্ছে। এ শুধু অনৈতিহাসিকই নয়, '৪৬-এর দেশভাগজনিত পরিবেশ-পরিস্থিতিকে আরও একবার ফেরানোর সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। নানা ভাবে সেই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কখনো মুঘল শাসনে ভারতবর্ষ কতটা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছিল সেই প্রচারের মাধ্যমে, কখনোও-বা প্রচার করা হয় আকবরও 'বঙ্গাব্দে'র প্রতিষ্ঠাতা, কখনো শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সময়ে এদেশের কারিগরেরা কতটা সমৃদ্ধ ছিল। হিন্দুদের সর্বনাশা এই মুঘল আমলের জয়গান ১৯৪৬-৪৭-এও করা হয়েছিল। সেদিন ভিটেমাটির সম্বলটুকুও হারিয়ে হিন্দুরা উপলব্ধি করেছিল তাঁরা কী ভুল করেছেন। তাতেও চেতনা হয়নি। তারপর দীর্ঘদিন এই ভ্রান্ত ইতিহাস পড়িয়ে বাঙ্গালির মগজ-ধোলাই সম্পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আজ সর্বভারতীয় পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সারা ভারতের হাত ধরে বাঙ্গালিও আজ বাঙ্গালি সত্তাকে বিসর্জন না দিয়ে ভারতীয় নাগরিক। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এত মৌলিক তফাত, এপারের বাঙ্গালি নিজের বাঙ্গালি পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নয়, তবে ওপারের বাঙ্গালির নিজের ধর্মীয় পরিচয়— মুসলমান ছাড়া আর বলার কিছু থাকে না। দেশভাগের সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একক অসমসাহসী উদ্যোগে ভারত থেকে বঙ্গপ্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার ও যুক্তবঙ্গ গঠনের যে উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছিল, একটু ভাবলেই বুঝবেন তাতেই আবার শান দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই কারণেই সেদিনের মতো এখনও তথাকথিত 'বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদে'র ধুয়ো তোলা হচ্ছে।

কিন্তু বাঙ্গালিকে বুঝতে হবে জাতীয়তাবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের মধ্যে তফাতটা কোথায়। আজ বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের নামে যা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদ। বাঙ্গালির জাতীয়তাবাদে ভারতের অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি সম্মান থাকে, পরভাষা-বিদ্বেষ নয়। তাতে ভারতীয়ত্ব ও শিকড়ের প্রতি গভীর মমত্ব থাকে, শিকড় উপড়ে ফেলার ধ্যাস্টামো নয়। জাতীয়তাবাদ একটি বিদেশি ভাবধারা, আমাদের সুমহান ঐতিহ্যে কখনও এই জিনিসটির দরকারই পড়েনি, কারণ পৃথক পৃথক হিন্দু রাজার শাসনাধীন পৃথক পৃথক অঞ্চল প্রশাসনিকভাবে আলাদা হলেও সাংস্কৃতিকভাবে একসূত্রে গাঁথা ছিল। তবুও বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদের ধারণার দরকার রয়েছে, কারণ মুসলমান ও ইংরেজ শাসনে হিন্দু-সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সুমহান ঐতিহ্য ধ্বংসের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন-মুক্ত হবার পরও দীর্ঘ কংগ্রেসি- জমানায় সেই সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এখন দেশজুড়ে শুরু হয়েছে। এখন বাঙ্গালিকে জাতীয়তাবাদের মোড়কে বিচ্ছিন্নতাবাদের আদর্শে দীক্ষিত করার উপক্রম চলছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ যে জাতিকে দেশকে ভালোবাসার কথায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেই জাতিকে দেশপ্রেম শেখাতে হবে না। প্রয়োজন শুধু চোখ-কান খোলা রাখা। ||

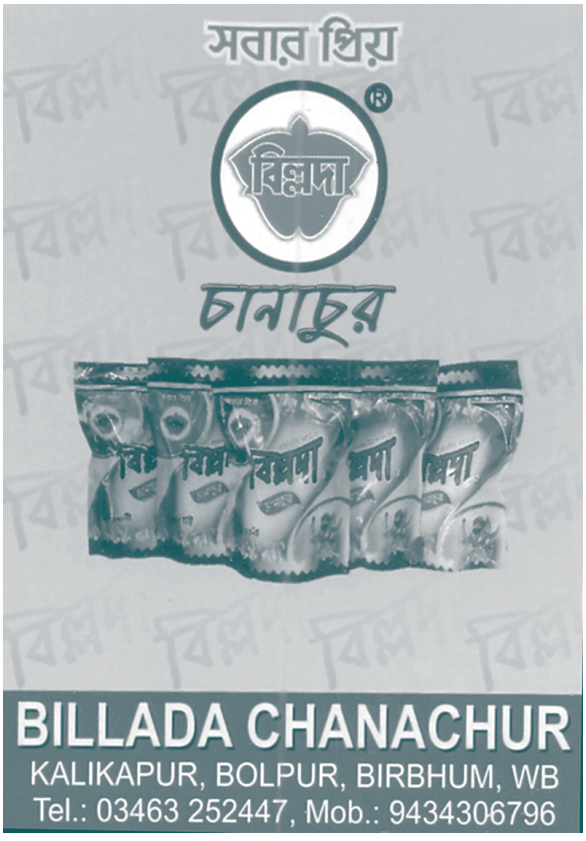

খিলাফত ও অসহযোগ গান্ধীজীর অপরিণামদর্শিতার ফল ভুগছে ভারত

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করে নেওয়াটা ভারতীয় মুসলমানরা ভালো চোখে দেখেনি। ওদিকে জার্মানি ও তুর্কির যুদ্ধকালীন সমঝোতা ব্রিটিশ সরকারের পছন্দ হয়নি। তার ওপর ব্রিটেন মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেমের ওপর 'অটোমান' সাম্রাজ্যের অধিপতি তুরস্কের সুলতান বা খলিফার আধিপত্য সমর্থন না করায় ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের ধর্মীয় নিরপেক্ষতায় আরও সন্দিহান হয়ে পড়ে। তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে উদারপন্থা ও আধুনিকতার জোয়ার এলে খলিফা ক্ষমতাচ্যুত হন, ভেসে যায় ইসলামি কানুনের একাধিপত্য। এরই বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় 'খিলাফত আন্দোলন' যার উদ্দেশ্য ছিল খলিফার নেতৃত্বে কোরান অনুসারী ইসলামের শাসন কায়েম করা। এই আন্দোলনের জোয়ারে ভেসেছিল ভারতীয় মুসলমানরাও যার অন্যতম কেন্দ্র ছিল আলিগড়।

প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পরে ১৯১৬ সালেও লিগের সমর্থক সংখ্যা ছিল মোটে ৫০০ থেকে ৮০০-র মধ্যে। তবে বছরটির একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল। ওই অধিবেশনেই মহম্মদ আলি জিন্না নামে এক তরুণ মুসলমান উকিল মুসলিম লিগের সমর্থক হয়ে পরবর্তীকালে গোটা দেশটার নিয়তির নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। ১৯১৯-এর মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার (The montagu-Chelmsford Reforms or the Government of India Act of 1919) প্রথম প্রাদেশিক স্তরে পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় পুরুষদের ভোটাধিকার মেনে নিলেও ভোটারের সংখ্যা ছিল মোট পুরুষ জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ, যার মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত। নারীবিহীন সেই ভোটার তালিকা যতই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হোক, সংস্কার হিসেবে ইতিহাসে গুরুত্ব আছে।

> **ভারত ভাগ হলো, কিন্তু জিন্না কিংবা সুরাবর্দিদের দাবি মেনে 'স্বাধীন ইসলামিক বাঙ্গলা'কে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো না। যদি ওদের দাবি মেনে নেওয়া হতো তাহলে হিন্দু বাঙ্গালিদের অবস্থা কতটা মারাত্মক হতে পারত, তা কি এখনকার রাজনীতিবিদেরা বোঝেন না? নাকি সব বুঝেও এই ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেস গৈরিক দলের ওপর দোষারোপের দ্বারা নিজেদের রাজনৈতিক অস্ত্রে শান দিয়ে রাখে?**

মুসলিম লিগকে সঙ্গে পেতে জাতীয় কংগ্রেস চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। ১৯১৬-এ লখনৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের অধিবেশনে একটা পারস্পরিক সমঝোতা হয়েছিল। লিগ জাতীয়তাবাদী কাজে কংগ্রেসকে সমর্থন দেবে, যার পরিবর্তে তাদের পৃথক ইলেক্ট্রোরেট মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি মেনে নেওয়ার পরেও মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে কাছে টানা যাচ্ছিল না। তাই শেষ অস্ত্র হিসেবে খিলাফতের মতো মৌলবাদী আন্দোলন সমর্থন করে সাম্প্রদায়িক তোষণকেই আশ্রয় করতে হলো। খিলাফত ব্যর্থ হলে ভারতীয় খিলাফতিদের জাতীয়তাবোধ যে শুকিয়ে যাবে— এটা বোঝার মতো দূরদর্শিতা কংগ্রেসি নেতাদের ছিল না।

প্রসঙ্গত খিলাফতের পটভূমিকা একটু বলি। তুরস্কে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ নিজের দেশে জাতীয়বাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন নির্মূল করতে এবং বিদেশি শক্তির আক্রমণ থেকে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে মুসলিম বিশ্বে 'সুলতান-খলিফা' হিসেবে নিজের আধিপত্য

কায়েম রাখতে খিলাফত তথা ইসলামি একাধিপত্যের ধারণা বিস্তার করতে থাকেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাঁর দূত জামালুদ্দিন আফগানি প্যানইসলাম মতবাদ প্রচারের জন্য ভারত সফর করার পর ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট অনুকূল সাড়া জাগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) পরাজয়ের পর ১৯১৯ সালে ভার্সেইলিস চুক্তি (Treaty of Versailles) অনুযায়ী অটোমান সাম্রাজ্যের আয়তন ও রাজনৈতিক আধিপত্য বেশ কিছুটা সংকুচিত হয়। তবে বিজয়ী ইউরোপীয় শক্তি প্রতিশ্রুতি দেয় অটোমান সম্রাটের 'খলিফা' পদমর্যাদা রক্ষা করবে। কিন্তু ততদিনে তুরস্কে পশ্চিমি ভাবধারায় নতুন জাতীয়তাবোধ বিকাশ লাভ করায় ইসলামি একাধিপত্য ধাক্কা খেতে শুরু করে। শুরু হয় খিলাফত আন্দোলন যার দাবি ছিল গোটা 'জায়িরাতুল আরব' অর্থাৎ আরব, ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর তুরস্ক খলিফার আধিপত্য।

১৯১৯-এ ব্রিটিশ সরকারের রাওলাট আইন দ্বারা রাজনৈতিক মামলার বিচারে জুরি তুলে দেওয়া এবং বিনা বিচারে বন্দি করার স্বৈরাচারী ফরমান জারি করায় দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল। তার ওপর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে সরকারের করাল চেহারায় দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার নামক সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়ে ভোলানো যাচ্ছিল না। সুতরাং হিন্দু- মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করার পক্ষে সময়টা ছিল আদর্শ। কংগ্রেস সেই চেষ্টায় তাই যে কোনও শর্তে মুসলমানদের পাশে পেতে চাইছিল। ওদিকে একই সময় ১৯১৯ সালে শৌকত আলি, তাঁর ভাই মহম্মদ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পির গুলাম মুজাদ্দিন সরহন্দি, ড. মুক্তার আহমদ আনসারি, রইসুল মুহাজিরিন, ব্যারিস্টার জান মহম্মদ জুনেজো, আজমল খান, হসরত মোহানি, সৈয়দ আতাউল্লা শাহ বুখারি ও ডাঃ হাকিম আজমল খানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে খিলাফত কমিটি, যার উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের খলিফার প্রতি ব্রিটিশদের অবস্থান বদলানো। এই সংস্থাটি ছিল লখনৌ ভিত্তিক এবং মূল

মুসলমান অভিজাতদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যও ছিল অভিন্ন ভারতভূমির মুক্তি নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও বাকি ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুদের প্রান্তিক করে দেওয়া। জিন্না হয়ে দাঁড়ান মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই উচ্চাশায় যথাযথ রূপকার যিনি মৃত্যুর আগে যথাসময়ে স্বপ্নটি পূরণও করিয়ে যান।

উদ্যোক্তা ছিলেন আলি ভাইয়েরাই। গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর পর ১৭ অক্টোবর ১৯১৯ প্রথম খিলাফত দিবস পালনের সময় তার সমর্থনে কংগ্রেস হরতালও পালন করে।

মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙ্গলার মাটিতে। আবার খিলাফতকে স্বাগত জানতেও বাঙ্গালি মুসলমানরা দেরি করেনি। বাঙ্গলায় এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা মনারুজ্জামান ইসলামাবাদি, মহম্মদ আক্রাম খান ও মুজিবুর রহমান খানের মতো কট্টর ইসলামপন্থীরা সোৎসাহে নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে নিলেন। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি' গঠিত হয়। মওলানা আবদুর রউফকে কমিটির সভাপতি, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদিকে সহসভাপতি, মওলানা আকরম খাঁকে সাধারণ সম্পাদক এবং মুজিবুর রহমান ও মজিদ বখশকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। 'কলকাতা খিলাফত কমিটি'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যিনি গ্রামবাঙ্গলায় খিলাফতের আদর্শ প্রচারের অন্যতম হোতা। তাঁদের সঙ্গে 'বঙ্গীয় খিলাফত কমিটি'তে ছিলেন কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাস।

১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর দিল্লিতে প্রথম খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে প্রথম দিন তাতে সভাপতিত্ব করলেন 'শের-এ বাঙ্গলা' এ.কে. ফজলুল হক। বিস্ময়করভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের উৎসাহ ছিল দেখবার মতো। সম্মেলনে দ্বিতীয় দিন সভাপতি ছিলেন স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ছিলেন মোতিলাল নেহেরু এমনকী ভারতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠাকামী কট্টর হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস নেতা মদনমোহন মালব্যও। ১৯২০ সালের ১৯ মার্চ ভারতব্যাপী দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালিত হয় এবং খিলাফতের দাবিতে কলকাতা, ঢাকা, চট্টোগ্রাম ইত্যাদি অচল করে পুনরায় হরতাল পালিত হয়! শুধু ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রশ্নে মুসলমানদের পাশে পাওয়ার আশায় গোঁড়া মৌলবাদী খিলাফত বিদ্রোহের সঙ্গে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গাঁটছড়া বাঁধার অবাস্তব চেষ্টা চলতে লাগল।

পরে ১৯২০ সালের ১ ডিসেম্বর নাগপুরে আয়োজিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী 'অসহযোগ আন্দোলন' ঘোষণা করতে জাতীয়বাদী আবেগের সঙ্গে সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষটিও অজান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২০-তে সার্বিস চুক্তি অনুসারে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও মিশর অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনে ফিরে এলেও তুরস্কের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার জাতীয়তাবাদীরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠায় খলিফা প্রার্থিত ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন না। উপরন্তু ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত চলা তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষে তুর্কি বিপ্লবী মুস্তাফা কামাল পাশা নেতা সার্বিস চুক্তি নাকচ করে ১৯২৩-এ লসানে চুক্তি করেন, যার দ্বারা ১৯২৪-এ নয়া রিপাবলিক অব টার্কি দেশে খলিফা পদটাই উঠে যায় এবং তুরস্কের গ্র্যান্ড অ্যাসেম্বলির ওপর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। খিলাফত আন্দোলনের সেটাই আনুষ্ঠানিক ইতি, কিন্তু ইসলামি একাধিপত্যের যে বাসনা উস্কে দেওয়া হয়েছিল, সেটার অবসান হয় না।

১৯১৯-এর আগে ও ১৯২৪-এ খিলাফত আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান উলেমাদের এত বেশি আগ্রহ আর দেখা যায়নি। খিলাফত আন্দোলন প্রত্যাহৃত হতেই মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আবেগও শুকিয়ে গেল। লাভের মধ্যে ১৯২০ সালে ভারতীয় খিলাফতি নেতারা মুসলমান-কূলের স্বাধীন শিক্ষা ও সামাজিক নবজাগরণের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল প্রথম থেকেই এতে ইসলমিক সাম্রাজ্যবাদের অশনিসংকেত দেখেছিলেন। তিনি বলেন, ১৯১১-১২-র ইন্দো আফগান যুদ্ধের পর যে ইসলামি ভাবাবেগ বিকশিত হয় বিশেষত ভারতে, তার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ক্রমশ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল রিফর্মকে বোকা বানানোর পর সৈয়দ আমির আলি এখন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি জাগানোর জন্য নিজের অনুগামীদের মধ্যে খোলাখুলি ইসলামি আধিপত্যবাদ প্রচার করছেন। ''The Turko-afgan conflict of 1911-12 while giving a new impetus to Pan-Islamism, particularly in India, helped also to bring out its true motive and character before all the world. Encouraged by success of his game of bluff in the matter of the Indian Council Reforms, Sayaed Amir Ali now almost openly avowed his allegiance to Pan-Islamism while his followrs commnced to exploit the natural sympathy of the Indian Musalmans with Ottoman Government in thir conflit with Italy" [Nationality and Empire; A running study of some Current Indian Problems]।

কিন্তু ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে কংগ্রেসের দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পরেই গান্ধীজী খিলফতকে স্বাগত জানিয়ে দেন। ১৯২০-র ২২ জুলাই আয়োজিত করাচির এক জনসভায় বলেন, 'মুসলমানদের সংকটে যদি হিন্দুরা সাহায্য করতে এগিয়ে না আসে, তাহলে হিন্দুদের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী'। কার্যক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটাই হয়েছে। এই তোষণ নীতি যে ভারতের ইসলামি মৌলবাদের ভিত শক্ত করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করবে, সেটুকু বোঝার মতো দূরদর্শিতা কি গান্ধীজীর ছিল না?

ক্ষুব্ধ হয়ে বিপিনচন্দ্র খিলাফতি ও মুসলিম লিগ সম্পর্কে চাঁচছোলা ভাষায় বলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত শত্রু। '...common enemy of Indian Nationalism in its truest and broadest sense'। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মতভেদের ফলে 'স্বদেশী' আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রাজনীতি থেকেই সরে দাঁড়ান।

খিলাফত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় একই সুর শোনা যায় লালা লাজপত রায়ের কণ্ঠেও— কারও অনুভূতিতে ঘা দিতে চাই না, কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিগত তিন বছরে সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদ যথেষ্ট বেড়ে গেছে। খিলাফত আন্দোলনের ফলেই মুসলমানাদের মধ্যে এটা বিকশিত হয়েছে এবং হিন্দু ও শিখদের ওপর তার প্রতিকূল প্রভাব পড়তে বাধ্য। ...এটা আরও দুর্ভাগ্যজনক যে মহাত্মা গান্ধী ও খিলাফতি নেতারা ধর্মকে এমন একট আন্দেলনের মধ্যে প্রাধান্য দিচ্ছেন, যার সঙ্গে ধর্মের মূলগত কোনও যোগ নেই। ''I have no intention of offernding anybody's susceptibilities, but if the existing conditions are properly analysed, it will be seen that sectarianism and narrow minded bigotry have been very much strngthened within the last three years. The Kilafat movement has particularly strengthened it among the Mohammedans and it has not been without its influence and reaction on Hindus and Sikhs... It was still more unfortunate that Mahatma Gandhi and the leaders of Khilafat movement have brought

religion into such a prominence in connection with a movement which was really and more fundamentally, more political than religious."

কবি নজরুল ইসলাম প্রথমে ফজলুল হকের কাগজ 'মুক্তি'-তে সাংবাদিকতা করার সময় সোৎসাহে অসহযোগ ও খিলাফতের সঙ্গে যোগ দিলেও পরে নিজের পত্রিকা 'ধূমকেতু'-তে 'কামাল পাশা' কবিতাটির মাধ্যমে খিলাফতের বিরুদ্ধে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের নবজাগরণ ও গণতন্ত্রের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আপত্তি জানান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। অথচ গান্ধীজী মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমে আকৃষ্ট করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদকেই স্বীকৃতি দিয়ে দেন।

ইতিহাস বইতে গান্ধীজীর এই পদক্ষেপকে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা হিসেবেই পড়ানো হয়। অথচ এই খিলাফত আন্দোলন ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠতে থাকে ভারতের মাটিতে সমর্থন পাওয়া মাত্র— 'যতক্ষণ না খিলাফত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য'। দুই খিলাফতপন্থী নেতা ফকির কায়ুমুদ্দিন ও মহম্মদ আবদুল বারির লেখা চিঠি তুলে ধরলে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়। '...এটা মনে রাখতে হবে যে, আমরা ওঁর (গান্ধী) ওপর ভরসা করে চুপচাপ বসে থাকব না। আমরা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করবই। এটা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমরা একমাত্র আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখব। মুসলমান অথবা অমুসলমান— আমাদের দায়িত্ব পালনে যে বাধা দেবে— তাকেই আমরা শত্রু প্রতিপন্ন করব। বলা বাহুল্য খিলাফত আন্দোলন ক্রমশ হিন্দু বিরোধী মৌলবাদের রূপ পায় যার উত্তরাধিকার আমরা এখনও ভোগ করছি এবং আরও ভয়ানকভাবে।

জাহির আলি নামে একজন তাঁর 'How Chauri Chaura deepened the Hindu-Muslim divide' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন চৌরিচৌরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ভারতে 'খিলাফত আন্দোল'ও মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, খিলাফত কমিটির প্রধান নেতারা গ্রেপ্তার হন। এর ফলে গান্ধীর সিদ্ধান্ত ও তাঁর অহিংসা নীতির প্রতি অসন্তোষ থেকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য গড়ে ওঠার বদলে ফাটল আরও বেড়ে যায়। অর্থাৎ সবদিক দিয়েই হিতে বিপরীত হয়েছিল এই রাজনৈতিক চালের ফলে।

এই অসম ও একতরফা সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টাকে কটাক্ষ করেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার অনেক পরেও মুখ খোলেন তিনি--- হিন্দু-মুসলমান ঐক্য হিন্দুদের বশ্যতা স্বীকারের মধ্যে দিয়ে হতে পারে না।... সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো, হিন্দুদের পরস্পর সংগঠিত হতে দেওয়া, আর তাহলে নিজে থেকেই সমাধান বেরিয়ে আসবে। না হলে সমস্যার সমাধান হয়েছে ভেবে মিথ্যে আত্মতুষ্টির ফাঁকে আসলে সমস্যাকে জায়গা করে দেওয়া হবে। ''Hindu-Muslim unity should not mean subjugation of Hindus... The best solution would be to allow Hindus to organise themselves and the Hindu-Muslim unity will take care of itself; it will automatically solve the problem. Otherwise we are lulled into a false sense of satisfaction that we have solved the problem when in fact we have only shelved it". [Muslim Sepreatism, cause and Consequence— Sita Ram Goel।

দেখা যাচ্ছে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা থেকে ভারত খিলাফত আন্দোলনকে সংগঠিত করায় বঙ্গীয় মুসলমানরা অগ্রণী হলেও ভারতে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদী ভাবাবেগ তথা রাজনীতির রাশ উর্দুভাষী মুসলমানদের হাতে চলে যায়। এর ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ান মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি নিজে উর্দুর বদলে ইংরিজিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। মুসলমান অভিজাতদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যও ছিল অভিন্ন ভারতভূমির মুক্তি নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও বাকি ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুদের প্রান্তিক করে দেওয়া। জিন্না হয়ে দাঁড়ান মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই উচ্চাশায় যথাযথ রূপকার যিনি মৃত্যুর আগে যথাসময়ে স্বপ্নটি পূরণও করিয়ে যান।

ভারত ভাগ হলো, কিন্তু জিন্না কিংবা সুরাবর্দিদের দাবি মেনে 'স্বাধীন ইসলামিক বাঙ্গলা'কে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো না। যদি ওদের দাবি মেনে নেওয়া হতো তাহলে হিন্দু বাঙ্গালিদের অবস্থা কতটা মারাত্মক হতে পারত, তা কি এখনকার রাজনীতিবিদেরা বোঝেন না? নাকি সব বুঝেও এই ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেস গৈরিক দলের ওপর দোষারোপের দ্বারা নিজেদের রাজনৈতিক অস্ত্রে শান দিয়ে রাখে? □

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেটে সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জয় ভীম স্লোগানের অন্তরালে জয় মিম

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভীম অর্থাৎ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকার এবং মিম অর্থাৎ মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন যা পরাধীন ভারতের মুসলিম লিগের মতো একটি মুসলমান রাজনৈতিক দল। এর সভাপতি হায়দরাবাদের মৌলানা কাম ব্যবহারজীবী আসাদুদ্দিন ওবেসি। এখন প্রশ্ন নিশ্চয় জাগবে যে, ব্যক্তি ভীমের সঙ্গে সংগঠন মিম জুড়ে দেওয়া কি শুধুই ছন্দের মিলের নিমিত্ত। ভারতবর্ষে দলিত বা পিছিয়ে পড়া হিন্দুদের জন্য মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে, তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার, সন্ত রবিদাস এঁরা আন্দোলন করেছেন পরবর্তীকালে বাবাসাহেব আম্বেদকার অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের হওয়ার কারণে তাঁকে নিজেকে বারবার অবমাননা ও অসম্মানের মধ্যে পড়তে হয়েছে। তিনি তার হাল করতে চেয়েছেন। দলিতদের জন্য সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবি সনদ ব্রিটিশ প্রভুর নিকট রেখেছেন। তৎকালীন গভর্নর ম্যাকডোনাল্ড রামসে দলিতদের জন্য আইনসভাতে সংরক্ষণের জন্য যে প্রস্তাব দেন তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং পুনাচুক্তির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। আজকে সারা ভারতে কী বিধানসভা, কী লোকসভা সবক্ষেত্রেই আমরা এসসি, এসটি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখি। এটা ব্রিটিশরাজ থেকেই চলে আসছে এবং এটি বাবাসাহেবের আন্দোলনের ফল।

বাবাসাহেব প্রকৃত অর্থেই দলিত হিন্দুর রক্ষাকর্তা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর সমগ্র জাতি তাঁর মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের মূল দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বর্ণহিন্দুদের অবহেলা ও অবজ্ঞা তাঁকে ভীষণ পীড়িত করত। কোনো সচেতন ও শিক্ষিত হিন্দু এইটা কখনোই সমর্থন করেনি। কিন্তু চাইলেই তো আর রাতারাতি সমাজ পাল্টে ফেলা যায় না। গান্ধীজী নিজে হরিজন আন্দোলন করেছিলেন। 'জল চল' ও 'জল অচল' নামের সামাজিক বিষাক্ত বিধিকে দূর করার জন্য তিনি দেশের নানান স্থানে তথাকথিত 'জল অচল' দলিতদের দিয়ে খাবার রান্না করিয়ে গণভোজনের ব্যবস্থা করতেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জাতপাতহীন হিন্দু সংগঠন গড়ার আদর্শ ও কর্মপন্থা বাবাসাহেব ও গান্ধীজীকে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজী, বাবাসাহেব ও ডাঃ হেডগেওয়াররা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এটি যেমন সত্য, তেমনই বলা যায় আজও ভারতীয় হিন্দু সমাজ জাতপাতের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়নি। এখনো শোনা যায় শুধুমাত্র দলিত হওয়ার কারণে একজনকে অত্যাচার করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজ এসব ঘটনার সংখ্যা কমে এসেছে। তবু এখনো জনজাগরণের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীনোত্তর ভারতে দলিত হিন্দুদের স্বাধিকার ও মর্যাদা আদায়ের জন্য কাশীরাম, মায়াবতীরা গণআন্দোলন গড়ে তুলেছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরকে আইকনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, এটুকুই। বাবাসাহেবের রাজনৈতিক দর্শন থেকে এঁরা শতযোজন দূরে থেকেছেন। বাবাসাহেবের বক্তব্য ও কর্মে কোনোরকম দ্বিচারিতা ছিল না। যদিও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইসলাম ও হিন্দুত্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন—'The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confused those within the corporation, there is nothing but contempts and enmity... whereever there is the rule of Islam there is his own country. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a hindu his kith and kin' একই সঙ্গে দলিত সমাজের মধ্যে স্বাভিমান ও আত্মমর্যাদবোধ বাড়ানোর জন্য তিনি মন্দির

মিম প্রধান আসাদুদ্দিন ওবেসি ও ভীম সেনা প্রধান চন্দ্রশেখর

প্রবেশ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এতেই থেমে না থেকে তিনি দলিতদের পূজা করার অধিকারের দাবি তোলেন। অথচ বর্তমান সময়ে তারা দলিত রাজনীতি করেন তারা তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে দলিতদের দলিতদের খেপানোই তাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা বলে মনে করে। ইসলাম সম্পর্কে বাবাসাহেবের মূল্যায়নের কথা তাঁরা উচ্চারণ করেন না। স্বাধীনোত্তর পাকিস্তানের নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের করুণ ইতিহাস তাঁরা বেমালুম ভুলে বসে আছে বা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষকে সেই অধ্যায় ভুলিয়ে রাখতেই চায়।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে জিন্নাহ সাহেব মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। ক্ষমতার দম্ভে মণ্ডলসাহেব ভাবলেন দলিত হিন্দুদের নেতা হয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করবেন। তাঁর এই অভিলাষ পূরণ হয়নি। তাঁর দলিত-অমুসলমান রসায়ন পাকিস্তানে ধোপে টেকেনি। তাঁকে প্রাণের ভয়ে রাতারাতি ভারতে পালিয়ে আসতে হয়। যে দলিত সমাজকে নিয়ে তিনি রাজনীতি করেছিলেন সেই অসহায় হিন্দুদের তিনি হিংস্র জন্তুর থাবার সামনে ফেলে চলে এলেন।

ইতিহাসের কী পরিহাস। পুনরায় একই অধ্যায়ের সূচনা করেছেন কিছু তথাকথিত দলিত নেতা। জিগনেশ মেভানি, চন্দ্রশেখর আজাদরা মিম-এর নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন পাওয়ার লোভে দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ভ্রাতৃঘাতী খেলায় মেতেছেন। উদ্দিন ভাইয়েরা হিন্দু ঐক্যের ভিতকে দুর্বল করার জন্য নানাভাবে এই নেতাদের উসকানি দিয়ে চলেছে। ভীম আর্মি তৈরি হয়েছে। দলিত সমাজের মানুষদের সামনে রেখে পেছন থেকে মিমের লোকেরা এদের পরিচালনা করছে।

একটা অংশবিশেষ এদের শিকার হচ্ছে। দলিত অভাবী মানুষদের টাকাপয়সা দিয়ে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে হিন্দু বিরোধী কাজ করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। এরকম নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। দলিত হিন্দু 'জয় ভীম' বলে জয়ঘোষ দিলে অন্যান্য বর্ণহিন্দুদের অস্বস্তির কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু মিমের নেতাটি জয় ভীমের সঙ্গে অতি

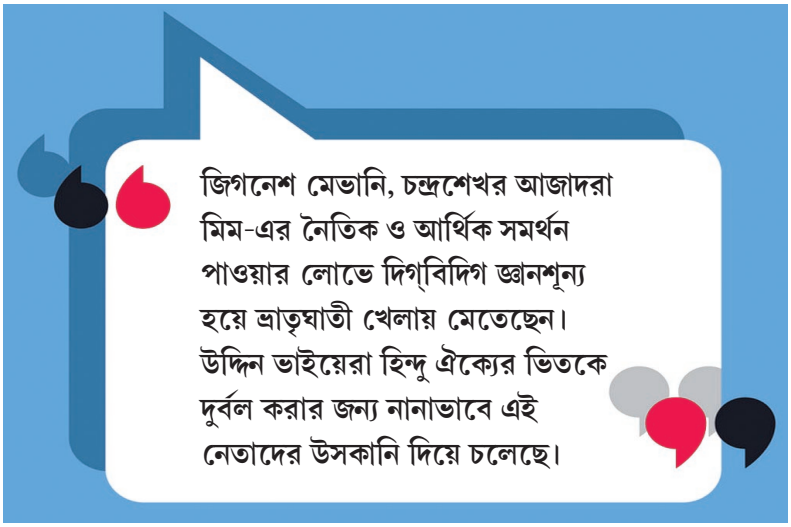

কৌশলে জয় মিম জুড়ে দিয়ে দলিতদের মধ্যে হিন্দুবিরোধী এক প্রতিস্পর্ধী শক্তি তৈরি করতে চাইছে। দলিত হিন্দু কোনো মানুষ 'জয় ভীম' বলা নেতাটিকে একবার প্রশ্ন করেছেন— 'আপনি ভারতমাতার জয় বলবেন না, কারণ তা ইসলাম বিরুদ্ধ, ইসলামে আল্লা ছাড়া কারো নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যায় না। তাহলে জয় ভীম বলছেন কেন?' তাহলে বুঝতে হবে এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা উঠে গেলে ওরা চিৎকার করেন। কাশ্মীরে দলিতদের দিয়ে শেখ সাহেবদের নোংরা পরিষ্কার করানো হয়। কিন্তু সমস্ত প্রকারের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। তখন দলিত-মুসলমান যৌথ মঞ্চের ভাবনা কোথায় উবে যায়? পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যখন দলিত হিন্দুদের অত্যাচার করা হয়— অপহরণ, খুন, ধর্ষণ ও জোরপূর্বক বিয়ে করা হয় তখন মুখ লুকিয়ে থাকেন কেন?

মিম ছাড়া আর যারা দলিত সমাজকে আত্মঘাতী খেলায় মত্ত করতে বদ্ধপরিকর তারা হলো নানান নামের কমিউনিস্ট দল। এদের মধ্যে অতিলাল শহুরে মাওবাদীদের ভূমিকা উল্লেখনীয়। ২০১৮ সালে মহারাষ্ট্রের ভীমা-করেগাঁওয়ের সহিংস আন্দোলনের পিছনে গৌতম নওলখা, আনন্দ তেলতাম্বেদের ইন্ধন এনআইএ খুঁজে পেয়েছে। অধুনা এই রাজ্যে পালঘর জেলার গড়চিঞ্চলী গ্রামে গণপিটুনিতে দুই সাধু ও তাদের গাড়ির চালককে হত্যা করার পেছনে কমিউনিস্ট মাতব্বরদের উসকানি থাকা অসম্ভব নয়। কেননা পালঘর মহারাষ্ট্রের একমাত্র বিধানসভা ক্ষেত্র যা কমিউনিস্টদের দখলে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত গবেষক রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে সেই কমিউনিস্টরা বাজার গরম করেন। ব্যাপারটা এমন যেন ৩৪ বছরের বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গে বা অতীতে কেরলে ও ত্রিপুরাতে দলিতদের উপর কমিউনিস্ট অত্যাচার হয়নি। পুরুলিয়া জেলাতে অনেক দলিত হত্যাকাণ্ড এদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এদের বিষ দাঁত ভেঙে গেছে আর এদের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে মিমের বান্দারা। এখন এখানে কুর্মি আন্দোলন শুরু হয়েছে। তারা আদিবাসী ঘোষিত হতে চায়। অন্যদিকে ভূমিজ ও বাউরি সমাজ আরও বেশি দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে। এইসব আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দেবার কাজ করছে মিম নানাভাবে। দলিত হিন্দুর আন্দোলনকে এরা হিন্দুবিরোধী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর জন্য সমস্ত ফ্রন্টে কাজ শুরু হয়েছে। জনমত সংগঠিত করার জন্য সংবাদ চ্যানেল পর্যন্ত খোলা হয়েছে। তার কাজ হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচিগুলোকে বেশি বেশি করে প্রচার করা। খণ্ড জাতীয়তাকে প্রচারের আলোকে এনে হিন্দু জাতীয়তাকে দুর্বল করা। □

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ছিলেন কমলনাথের ভাগনে রাতুল পুরী

ঋতু সারিন

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড চপার কেলেঙ্কারিতে মিশেল মামার মতো বিদেশ থেকে ধরে আনা দালাল রাজীব সাক্সেনা জেরায় স্বীকার করেছেন যে শুধু অগাস্টা নয়, তাঁর মাধ্যমে আরও বহু বেআইনি লেনদেনের অর্থ হাতবদল হয়েছে। এই সূত্রে ই.ডি. ইতিমধ্যেই বর্তমানে জামিনে খালাস রাজীব সাক্সেনার দুবাইয়ের একটি ভিলা ও ৫টি সুইস ব্যাঙ্ক খাতা বাজেয়াপ্ত করেছে। সাক্সেনা জানিয়েছেন ওই সমস্ত টাকাই অপরাধমূলক অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত। ই.ডি.-র জেরায় তিনি সম্প্রতি মেনে নিয়েছেন ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তাঁর স্ত্রী শিবানী সাক্সেনা গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাতুল পুরী তাঁকে ওই সমস্ত জালিয়াতি অ্যাকাউন্টের টাকা অন্য কোনো নামে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

সাক্সেনা জানিয়েছেন কারচুপি করে তিনি বেআইনি টাকা রাখবার জন্য যে নতুন কোম্পানি খোলেন সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকর্মীকেও শেয়ার হোল্ডার করে নেন যাতে বিষয়টা ধামা চাপা থাকে। আসল মালিককে কেউ জানতে না পারে। এমন অনেক ফর্জি অ্যাকাউন্টের হদিশ পরবর্তীকালেও পাওয়া গেছে। ২০১৯ সালে জানুয়ারিতে পলাতক সাক্সেনাকে দুবাই থেকে ভারত সরকার দেশে নিয়ে আসে। এর পরই ই.ডি.-র জেরা এগোনোর সঙ্গেই তাঁর ৩৮৫ কোটি টাকার সম্পত্তি 'অপরাধ দ্বারা অর্জিত' (Proceeds of Crime) ঘোষণা করে বাজেয়াপ্ত করেছে। সাক্সেনা রাজসাক্ষী হবার চেষ্টা করলেও তথ্য গোপনের কারণে ই.ডি. তা বাতিল করার জন্য আবেদন করেছে।

ই.ডি.-র তরফে দেওয়া ১০০০ পাতার চার্জসিটে সাক্সেনা জানিয়েছেন যে তাঁর ব্যাঙ্ক খাতায় প্রতিরক্ষা দালাল সুষেণ মোহন গুপ্তা, আইনবিদ গৌতম খৈতান এবং কমল নাথের ভাগনা ব্যবসায়ী রাতুল পুরীর মাধ্যমে যে টাকা জমা পড়ত তা যে অগাস্টা দালালির টাকা তা তিনি জানতেন না (পেশায় সি.এ)। তবে ই.ডি.-কে তিনি একথা জানিয়েছেন যে তদন্ত শুরু হওয়া মাত্রই রাতুল পুরীর তরফে নতুন কারচুপি করে কেলেঙ্কারি ধামাচাপার চেষ্টা শুরু হয়। সাক্সেনার ফর্জি কোম্পানি ম্যাট্রিক্স এমারজিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডকে রাতারাতি তিনি Arboles নামে একটি নতুন জাল কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেন। ম্যাট্রিক্স-এর সমস্ত শেয়ার এই নতুন কোম্পানির পূর্বে উল্লেখিত স্বাস্থ্যকর্মীদের নামে ট্রান্সফার হয়। এতে শেয়ার কেনা বেচার জন্য কোনো টাকার লেনদেন হয় না, কেননা সবটাই জালিয়াতি। আসল মালিক তো ছিলেন রাতুল পুরী। লাভের সব গুড় তিনিই খেতেন এরা চাকর মাত্র।

পুরীর আইনজীবীরা সাক্সেনার জেরা শুরু হতেই বারবার তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করেন যাতে তিনি কেবলমাত্র অগাস্টা নিয়েই কথা বলেন, রাতুল পুরীর বিষয়ে মুখ যেন কোনো মতেই না খোলেন। একজন হিসাব বিশেষজ্ঞকে নিয়ে রাতুল পুরী দুবাইয়ে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে দেখাও করে আসেন। এর মূল কারণ সাক্সেনার বয়ানে— যে তিনি রাতুলকে বারবার তাঁর ব্যাঙ্কে Gerotrade, Pacific International, IZC, Midas Metal প্রভৃতি জাল কোম্পানিগুলিতে গ্লোবাল সার্ভিস নামে এক অজানা কোম্পানি থেকে বিপুল অর্থ জমা পড়ার উৎস জানতে চান। তিনি একইসঙ্গে জানান ই.ডি. কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে ঠিক এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজছেন ও তাঁর কাছে জানতে চাইছেন। প্রাথমিক ভাবে পুরী গ্লোবাল সার্ভিস এফ.জেড.ই অ্যাকাউন্টটিকে ব্যবহার করেই যে টাকা পাঠাচ্ছেন তা অস্বীকার করলেও সাক্সেনার অডিটর তাকে জেরা করে প্রমাণ ও কাগজপত্র দেখাতেই তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে তাঁর নিয়োজিত হাওয়ালা অপারেটরদের মাধ্যমেই তিনি বেআইনি আর্থিক লেনদেন করেছেন। একই সঙ্গে এই তথ্য যাতে কোনোভাবেই ইডি-র কাছে না পৌঁছয় সে জন্য ভয় দেখিয়ে যান। সাক্সেনার রাজসাক্ষী হতে চাওয়ার মূলে রয়েছে ই.ডি-কে দেওয়া তাঁর বিপুল তথ্য সরবরাহ করা যার সূচিপত্রই ১০ পাতার।

উদাহরণ স্বরূপ সাক্সেনা প্রায় ১ ডজন ব্যাঙ্ক খাতার হদিশ ও লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ তদন্ত সংস্থাকে দিয়েছেন যেগুলি অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড তদন্তে সহায়তা করছে। এর মধ্যে মহাগুরুত্বপূর্ণ পুরীর global servic FZE থেকে আসা বিপুল অর্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। রয়েছে রাতুল পুরীর ব্যক্তিগত আকাশচুম্বী নৈশ ও অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য তাঁকে দেওয়া সুইস ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড-এর তথ্য ও ব্যাঙ্কের তরফে করা সন্দেহজনক লেনদেনের তালিকা। তদন্তে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাক্সেনা কবুল করেছেন যে ভারতে পুরী তাঁর বিপুল বিলাসবহুল জীবনযাপনের খরচা

গোপনের জন্যই তাঁর (সাক্সেনার) নামের কার্ড ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেখানে টাকা অজানা কোনো উৎস থেকে এসে জমা হতো।

ইডি-র জেরা করার যে বিস্তারিত বিবরণ চার্জশিটে উঠে এসেছে সেখানে ২০১৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রাতুল পুরীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নিয়ামত বক্সীর বাড়ি রেড করার উল্লেখ রয়েছে। ওই রেড থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক তথ্যবহুল প্রচুর পরিমাণ 'ই-মেলের' হিসেব কিন্তু সাক্সেনা ইডি-কে দেননি। যে কারণে ইডি তাঁকে রাজসাক্ষী হতে দিতে চায় না। এ সমস্ত মেলের মাধ্যমে সাক্সেনা যে পুরীর হয়ে বিদেশে থাকা আরও বহু off shore কোম্পানির মাধ্যমে লেনদেন চালাত তাও উঠে এসেছে। এই কোম্পানির আগে উল্লেখিত সংস্থাগুলি ছাড়াও Continental Administration, Technic Trade, Maxima Saftware নামের অজস্র জাল সংস্থা রয়েছে। ভাবুন, জালিয়াতির জাল কতদূর বিস্তৃত হতে পারে ও লোভ কত সীমাহীন মাত্রা ছুঁতে পারে। এদের বেশির ভাগই চলত ট্যাক্স না দেওয়ার স্বর্গ Mauritas থেকে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ফুলে ফেঁপে ওঠা এই সব জালিয়াতি কোম্পানিগুলি থেকে দেদার কালো কামাইয়ের অর্থে রাতুল পুরী রাতের পর রাত বিদেশে কী বেহিসেবী স্ফূর্তি করেছেন এ নিয়ে আগে লেখা হয়েছে। ২০১৪ সালের পরই কেবল দেশ বিদেশে ছড়ানো বেনামী ফর্জি কোম্পানিগুলির সর্বনাশ নেমে আসা শুরু হয়, জালে পড়তে থাকে রুই-কাতলারা। রাতুল পুরীর কেস তেমনি একটা। মাঝে মাঝে যে শোনা যায় দালালি ছাড়া একটা আমলে ভারত অস্ত্র কিনতে পারত না এগুলি তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

সাক্সেনার দেওয়া ২০০ পাতার একটি চুক্তিপত্রে তাঁকে জনৈক সুইস অংশীদার মারা যেতে রাতুল পুরী ও তাঁর পরিবারের তরফে কারবার চালিয়ে যেতে নোমিনি করারও উল্লেখ রয়েছে। আদ্যপ্রান্ত জালিয়াতির এত বড়ো উদাহরণ অগাস্টা মামলাটিকে এগিয়ে না নিয়ে গেলে দেশবাসী জানতেও পারত না। ১০০০ পাতার চার্জশিট জমা পড়ার পর ইডি-র তদন্ত গতি পেয়েছে। জেলে মিশেল অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি 'করোনা মহামারীর' সুযোগ নিয়ে আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন জামিনের জন্য। তাঁর মতো লোকের পক্ষে জেল নাকি মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় অন্য কয়েদিদের মাধ্যমে সংক্রমণ হতে পারে। সরকারি উকিল জানান, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বিদেশ থেকে এই ইটালিয়ানকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি কয়েকবছর ধরে নানা ফন্দিফিকির করে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান। এখন জামিন দিলে নতুন মতলব করে দেশ ছাড়তে পারেন। আদালত এ যুক্তি মেনে নিয়েছে। তিনি বর্তমানে জেলে। তবে তিনি জালিয়াতি দিশি উৎস মুখের সন্ধান অবশ্যই দিয়েছেন। মামলা এবার উঠবে।

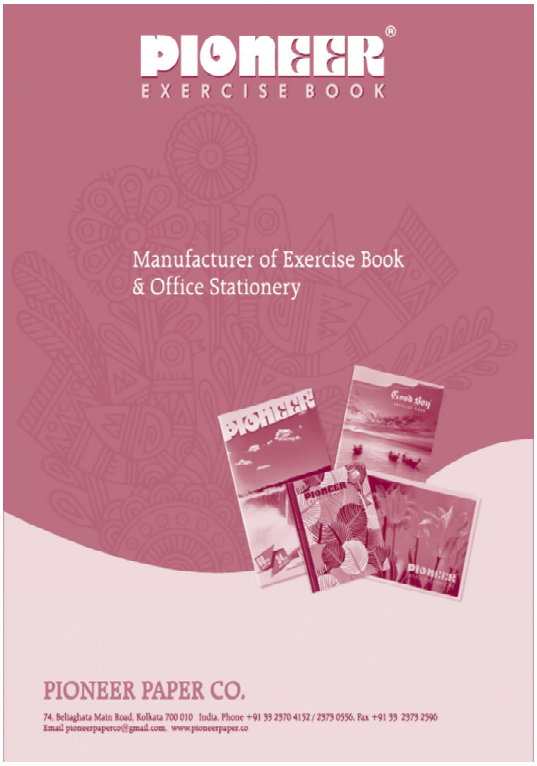

(লেখক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক)

পরলোকে বালকৃষ্ণ নাইক (কেষ্টদা)

রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বালকৃষ্ণ নাইক গত ১৮ নভেম্বর রাত্রি ১১টা ২০ মিনিটে নির্বাণ লাভ করলেন নেপালের

কুশীনগরে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। শিশুকালেই মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে (শম্ভাজীনগর) স্বয়ংসেবক হন। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে এম.টেক করার পর ক্যালিফোর্নিয়াতে অধ্যাপনা করেন। নাসার কাজেও যুক্ত ছিলেন। এক সময় চাকরি জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা প্রচারক, হাওড়া জেলা প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সহ সভাপতির দায়িত্বও নির্বাহ করেছেন।

শোক সংবাদ

মেদিনীপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক মনোরঞ্জন করির মাতৃদেবী লক্ষ্মী গিরি দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৬ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি মেদিনীপুর নগরের স্বয়ংসেবক ও প্রচারকদের মাতৃসমা ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এখন যেভাবে এগুচ্ছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥

(১) আমি গর্বিত মুসলমান, আর পুজোয় যাবো না—বললেন সাকিব। সাকিব একজন খ্যাতিমান ক্রিকেটার— কিন্তু এই পরিচয়ের চেয়েও তার বড়ো পরিচয় হচ্ছে সাকিব একজন সাচ্চা মুসলমান। তিনি নিজেই ঘোষণা করে বলেছেন, তিনি একজন 'গর্বিত মুসলমান'। মানুষ, ক্রিকেটার— এসব ছাপিয়ে সাকিব একজন 'গর্বিত মুসলমান'— এই পরিচয়টাই বড়ো এখন। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতা, শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশ যে পথে এগুচ্ছে তার রূঢ় বাস্তবতা।

ঘটনার সূচনা, সাকিব কলকাতায় কালী পূজা উদ্বোধন করেছেন--- এমন একটি সংবাদে। একজন সেলিব্রেটি ক্রিকেটার কালী পূজা উদ্বোধন করলে কী ক্ষতি হয়— তা নিয়ে এই বাংলাদেশে আলোচনা কিছু নেই। সাকিব আসলে কালী পূজা উদ্বোধন করেছেন কি না— তা পরিষ্কার করার দায়িত্বও কোনো গণমাধ্যম বা তার ভক্তরা কেউ জোরালোভাবে নেয়নি। কিন্তু মুসলমান হয়ে পুজো উদ্বোধনের কারণে তাকে কুপিয়ে হত্যার হুমকি দিতে পিছপা হয়নি।

বাংলাদেশে একটি গণমাধ্যমে লেখা হয়েছে, পশ্চিমের খ্রিস্টানদের দেশে ইদের মাঠে —এমনকী মসজিদের ভেতর অনুষ্ঠিত ইদের জামাতেও অমুসলমান জনপ্রতিনিধিরা আসেন, এসে নামাজিদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। জনপ্রতিনিধিদের সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েই আনা হয়। মসজিদের ভেতর ভিন্নধর্মী জনপ্রতিনিধিদের যাওয়া এবং মুসলমানদের ইদের জামাতে বক্তৃতা করা নিয়ে কোথাও কোনো আপত্তির কথা শোনা যায়নি। সাকিবের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পুজো 'উদ্বোধন'-এর খবর প্রকাশিত হলে সাকিবকে ক্ষমা চাইতে হয়, ব্যাখ্যা দিতে হয়— সেখানে তিনি আসলে কী করেছেন। সাকিবকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে হয়— তিনি আর কখনো এমন কাজ করবেন না। কী চমৎকার একটি দেশ!

আরও বলা হয়েছে, কীসের ভয়ে সাকিবকে এভাবে ক্ষমা চাইতে হয়। সেটি কি মুসলমানদের ক্ষোভের কারণেই? সেটি সত্য হলে আমরা যে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলি, সেই বক্তব্যটি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যায় না? ঢাকার গণমাধ্যম তো বলছে, এক যুবক ভিডিয়ো বার্তায় সাকিবকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। সব থেকে বিস্ময়কর, সাকিবের কালীপূজা উপাখ্যান নিয়ে যত বিক্ষোভ হয়েছে,

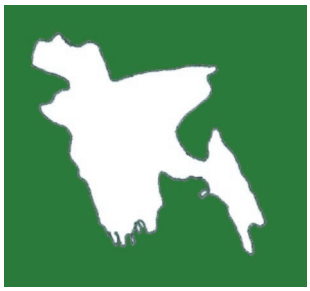

তাকে প্রাণে মেরে ফেলার ঘোষণার বিরুদ্ধে ততোটা প্রতিবাদ হয়নি।

কুপিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়ার পর তড়িঘড়ি ফেসবুক লাইভে এসে ক্ষমা চাইলেন সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এক ভিডিয়ো বার্তায় ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেন, 'আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আমি নিজেকে একজন গর্বিত মুসলমান বলে মনে করি। আমি সেটাই চেষ্টা করি পালন করার।' তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'নিউজ, সোশ্যাল মিডিয়া-সহ নানা জায়গায় এসেছে যে, আমি পূজার উদ্বোধন করতে গিয়েছি। যা আমি কখনো যাইওনি কিংবা করিওনি। আসলে সেটি উদ্বোধন হয়েছে আমি যাওয়ার আগেই। সচেতন মুসলমান হিসেবে আমি এটা করবো না। তবু বলব, হয়তো ওখানে যাওয়াটাও আমার ঠিক হয়নি। সেটি যদি আপনারাও মনে করে থাকেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ক্ষমাপ্রার্থী। আমি আশা করবো, আপনারা এটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এরকম কোনও ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেটিও আমরা চেষ্টা করবো।' সাকিবের ভাষা বলছে, তিনি পুজোয় গিয়ে গর্হিত কাজ করেছেন। ভবিষ্যতে একাজ আর করবেন না।

এর আগে গত ১৫ নভেম্বর রাতে ফেসবুকে ভিডিয়োতে সিলেট থেকে মহসিন বলে নিজের পরিচয় প্রকাশ করা এক যুবক (সিলেটি ভাষায়) বলেন, 'সাকিব আল হাসান কয়দিন আগে দেশে আইছইন। কিছুদিন আগে তাইন হজে গেছিলা, তখন খুশি হইছিলাম। কিন্তু তাইন ইবার দেশে আইয়া আবার গেলাগি ইন্ডিয়াতে পূজা উদ্বোধন করাত। ইটায় মুসলমানের কলিজায় আঘাত করছে। আমি ফাইলে (পাইলে) তারে কোপাইয়া কোপাইয়া কাটিমু।' এসময় তিনি একটি রামদা প্রদর্শন করেন।

কলকাতায় যে পুজো নিয়ে সাকিবকে হুমকি, তার মূল উদ্যোক্তা এলাকার বিধায়ক পরেশ পাল। তিনি বিবিসিকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'পূজার উদ্বোধনের দিন তো কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও ছিলেন। হাকিম প্রতিবছরই আমার পুজার উদ্বোধনে থাকেন। এবছর কলকাতায় বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত-সহ একাধিক মুসলমান ধর্মাবলম্বী কর্মকর্তা হাজির ছিলেন। কিন্তু তারা কেউই পূজার ধর্মীয় কোনও কাজ তো করেননি। প্রতিমা উদ্বোধন করেছেন আদ্যাপীঠের হিন্দু সন্ন্যাসী মুরাল ভাই। কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো দেখিয়ে তিনি বলেন, ওখানে একটা বড়ো প্রদীপ রাখা ছিল। সকলেই সেই প্রদীপটা জ্বালিয়েছেন। আমি যেমন জ্বালিয়েছি, তেমনি সাকিব আল হাসন, ফিরহাদ হাকিম— সবাই জ্বালিয়েছেন'।

(২) হাসিনার মদতে শক্তিশালী ইসলামি দলগুলোই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করেছে :

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মদতে শক্তিশালী ভিত্তি পাওয়া ইসলামি দলগুলোই এখন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ক্ষমতাসীন

আওয়ামি লিগ ও সরকারকে। ঢাকার দক্ষিণে ধোলাইপাড় মোড়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ভাস্কর্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ইসলামপন্থী কয়েকটি দল কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় সমাবেশ করেছে। এই দলগুলো শেখ মুজিবের ভাস্কর্যকে 'মূর্তি' আখ্যা দিয়ে এর নির্মাণ বন্ধ করা না হলে এর বিরুদ্ধে আরও কর্মসূচি নেয়ার হুমকি দিয়েছে।

বিএনপি ও জামায়াতকে ইসলামিক রাজনীতির ময়দানে কুপোকাত করতে ইসলামি দলগুলোকে 'উদার' পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দিয়ে কাছে টেনেছিলেন শেখ হাসিনা। এই দলগুলো একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিল। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী হাসিনা শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামিকরণ করেছিলেন। পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হিন্দু লেখকদের রচনা। জিয়াউর রহমান, এরশাদ এবং পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত সরকারও যা করেনি, শেখ হাসিনা তাই করেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমানে উন্নীত করেন। সমমর্যাদা পায় মাদ্রাসার ডিগ্রিও। যে কারণে ইসলামি দলগুলোর বাড়বাড়ন্ত। এখন সেই ইসলামি দলগুলোই ঢাকার ধোলাইপাড়ে শেখ মুজিবের ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করছে। বিরোধিতা করছে দেশে মুজিবের ভাস্কর্য স্থাপনের। ইসলামি নেতাদের অন্যতম আমীর সৈয়দ রেজাউল করীম বলেছেন, আওয়ামি লিগ ইসলামি শরিয়তের বিরুদ্ধে কিছু করবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটাই তারা এখন মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে যে ইস্তেহার প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে তিনি কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন যে, শরিয়া বিরোধী কোনো আইন তিনি পাশ করবেন না এবং শরিয়া বিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন দল বা সংগঠনের সঙ্গে আওয়ামি লিগের সমঝোতার রাজনীতির সুযোগ নিয়ে তারা এখন শেখ মুজিবের ভাস্কর্যের ওপরই আঘাত করছে। যেটা আওয়ামি লিগের জন্যই বিব্রতকর বলে তারা মনে করেন। কট্টরবাদী হেফাজতে ইসলামের

কালীপুজোর মণ্ডপে সাকিব

সঙ্গে আওয়ামি লিগের সখ্য এবং ধর্মভিত্তিক দল বা বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতা করে চলা— এই সুযোগ নিয়ে তারাই আওয়ামি লিগের স্পর্শকাতর বিষয়ে আঘাত করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবায়দা নাসরিন বলেন, পরিস্থিতির দায় আওয়ামি লিগের ওপরই বর্তায়। আমার কাছে মনে হয়, আওয়ামি লিগ ইসলামি দলগুলোকে আশকারা দিয়ে এমন পর্যায়ে এনেছে যে এখন আওয়ামি লিগের খোদ নিজের ঘরেই সাপ ঢুকেছে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামি লিগ যে কারণে আশকারা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে ভোট এবং ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের শক্ত অবস্থান ধরে রাখার জন্য। সেই জায়গা নিতে আওয়ামি লিগ এখন তার ফল ভোগ করছে সবচেয়ে বেশি। কারণ আওয়ামি লিগের এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে তারা না পারছে হজম করতে, না পারছে উগরাতে।

বিশ্লেষকরা বলেছেন, বাংলাদেশে ভাস্কর্যের বিরোধিতা করা নতুন বিষয় নয়। তিন বছর আগে ২০১৭ সালে ঢাকায় সুপ্রিমকোর্ট চত্বরে গ্রিক দেবীর আদলে একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। হেফাজতে ইসলাম-সহ ইসলামপন্থী কয়েকটি সংগঠনের বিরোধিতার মুখে সেই ভাস্কর্য সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ওই সময় বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভাস্কর্য সরানোর দাবিতে হেফাজতে ইসলামের সমর্থকরা ঢাকায় বিক্ষোভ করেন। সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে গ্রিক দেবীর মূর্তি অপসারণের দাবি জানিয়ে তারা বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট সবার প্রতিষ্ঠান। কাজেই সেখানে এরকম মূর্তি স্থাপন করা যাবে না। হেফাজতের তৎকালীন নেতা আমির আহমদ শফি এক বিবৃতিতে এই দাবি জানিয়ে তাঁর ভাষায় বলেছিলেন, গ্রিক দেবীর মূর্তি স্থাপন করে বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যে আঘাত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ভাস্কর্য সরানোর ব্যাপারে তাদের দাবির প্রতি তখন সমর্থন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উল্লেখ্য, তখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। তিনি পরে বিদেশে গিয়ে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। তিনি পরে এক বইতে অভিযোগ করেন, তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।

ইসলামি দলগুলোর নেতারা ভাস্কর্য ও মূর্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য মানতে রাজি নন। তারা বলছেন, ভাস্কর্য ও মূর্তি একই বিষয়। যেহেতু ইসলামি শরিয়ত এটাকে সমর্থন করে না, সে হিসাবে আমরা এটার প্রতিবাদ করেছি। বরঞ্চ আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভূমিকা বা অবদান, এ ব্যাপারে তার জন্য দোয়া এবং তার রুহের মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহর ৯৯ নাম খচিত একটা মিনার বা ওই ধরনের একটা স্মৃতি যদি তৈরি করা যায়, তাহলে এর মাধ্যমে তার রুহের ওপর সোয়াব পৌঁছুতে থাকবে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'পাকিস্তান ও সৌদি আরব-সহ সকল মুসলমানপ্রধান দেশেই ভাস্কর্য আছে, যা নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ইতিহাসের মহানায়কদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের স্মারক। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলমান দেশ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার প্রাণকেন্দ্রে হিন্দু পৌরাণিক চরিত্রের ভাস্কর্য রয়েছে, যেগুলোকে পৌত্তলিকতা বা মূর্তি আখ্যায়িত করে অপসারণের ধৃষ্টতা কখনও সে দেশের কট্টরপন্থীরা প্রদর্শন করেনি। বাংলাদেশে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রশ্রয়ের কারণে মৌলবাদী অপশক্তি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তাতে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'শূন্য সহিষ্ণুতা'র ঘোষণা অচিরেই প্রহসনে পরিণত হবে। আমরা দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় আশঙ্কা করছি, যা আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে।'

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

অর্থপুরুষার্থ ও শিক্ষা

(৫) পরিশ্রম নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের স্থান আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিবেকের আধারে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। মানুষের কষ্ট কম করতে ও কাজ সহজে এবং ভালোভাবে করতে যন্ত্রের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটা মানুষের সহায়ক হওয়া চাই, মানুষের স্থান নেবার তথা তার কাজকে কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, গরম বস্তুকে ধরবার জন্য চিমটে, জিনিসের আনা নেবার জন্য গাড়ি এবং তাকে চালাবার জন্য চাকা, কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য কপিকলের মতো যন্ত্রাদি খুব উপকারী কিন্তু পেট্রোল, ডিজেল, বিদ্যুৎ শক্তিতে চালিত, একমাসে বিপুল উৎপাদনের আয়োজনকারী, উৎপাদনকে মুখ্য গুরুত্বপ্রদানকারী এবং অনেক মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা কেড়ে নেবার যন্ত্র বাস্তবে হচ্ছে আসুরিক শক্তি। এসব কিন্তু ত্যাজ্য হওয়া দরকার। আজ আমরা এই আসুরীশক্তির শিকারে পরিণত হয়েছি । একেই বিকাশের মাপকাঠি বলে মনে করা হচ্ছে।

(৬) অর্থব্যবস্থা এবং মানুষের আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। আর্থিক স্বাধীনতা হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার কথা হওয়াই চাই। যে মানুষ আর্থিক দৃষ্টিতে স্বাধীন নয় সে দীনহীন হয়ে পড়ে। এবং এমন মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে সংস্কৃতিরই ক্ষতি হয়ে থাকে। এজন্য অর্থব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে তা উৎপাদন কেন্দ্রিক না হয়ে পড়ে, বিতরণ দুষ্কর না হয়ে পড়ে এবং বস্তুর সহজলভ্যতায় যেন বিঘ্ন না ঘটে। এটা সমগ্র সমাজকে দরিদ্র করে দেয়। এই জন্য যন্ত্র আধারিত উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।

(৭) বর্তমানে যে প্রকারে যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে তাতে তিনপ্রকার ক্ষতি হয়ে থাকে। এক, পেট্রোলিয়ামের মতো প্রাকৃতিক খনিজের বিনাশকারী ব্যবহারের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেট্রোল, ডিজেল, বিদ্যুতের মতো শক্তির ব্যবহারে লোহা, সিমেন্ট ও প্লাস্টিকেরের মতো জিনিস বানিয়ে তার ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করে থাকে। উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণের জন্য রোজগার হারিয়ে মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে থাকে। বর্তমানে এমনই ভীষণ পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে যে, বিনা যন্ত্রে বিনা কারখানায়, বিনা পেট্রোল, ডিজেলে বিনা বিদ্যুতে কিছু সম্ভব এটা আমাদের মনেই হয় না। এর বিষচক্র থেকে বাইরে বের হবার বা উপযুক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন আছে।

(৮) পঞ্চমহাভূত, বনস্পতি জগৎ এবং প্রাণীজগৎ অর্থব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাস্তবে ভৌতিক সমৃদ্ধির মূল ভিত্তিই হচ্ছে এইসব। পরমাত্মার কৃপাতে ভারতে এসব উপকরণ বিপুল মাত্রায় রয়েছে। ভারতের ভূমি উর্বর এবং কেবল ভারতেই বছরে তিনবার ফসল তোলা যায় এমন জমি রয়েছে। ভারতের জলবায়ু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অধিক অনুকূল। ভারতে ছয়ঋতু নিয়মিতরূপে এসে থাকে। আমাদের বনাঞ্চল ফুল, ফল ও ওষুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। তুলসী, নিম, গঙ্গা, গোমাতা ভারতের ভাগ্যেই আছে। ভূমি, জলবায়ু, বন, পর্বত, তাপমান ইত্যাদি সব শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের রক্ষক ও পোষক। সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের দৃষ্টিতে ভারতের সমৃদ্ধ হবার সব সম্ভাবনাই রয়েছে।

(৯) সমৃদ্ধির দ্বিতীয় আধার বলতে প্রাকৃতিক সম্পদাবলীর ব্যবহারে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে আমরা কতটা ভালো ও কতটা উৎকৃষ্ট উৎপাদন করে থাকি সেটাই বোঝায়। যুগ যুগ ধরে ভারত নিজের নিপুণ হাতের ও সৃজনশীল বুদ্ধির ব্যবহার করে প্রভূত উৎকৃষ্ট ও গুণসম্পন্ন উৎপাদন করেছে। ভারতে উৎপাদিত এমন অনেক বস্তু আছে যা গুণমান ও উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে আজও বিশ্বে অদ্বিতীয়। যন্ত্রের নির্মাণ, বস্তুর নির্মাণ, উৎপাদনের ব্যবস্থা, বিতরণের ব্যবস্থা সংস্কারযুক্ত সংযমিত উপভোগও সমৃদ্ধির ভিত্তি হয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা এই বিবেক হারিয়ে ফেলেছি। শ্রমকে হেয় মনে করে বিপরীত বুদ্ধির শিকার হয়ে আমরা যন্ত্র আধারিত, প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণের উপর নির্ভরশীল শিল্পকে উৎসাহ দিয়ে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও ব্যাধিকে আমন্ত্রণ করেছি। এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

(১০) সমগ্র সমাজের সঠিক সমৃদ্ধির জন্য ভারতে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা রয়েছে যা বিশ্বের কোথাও নেই এবং বর্তমান সময়ে ভারতেও তা অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে যে, শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বস্তু সমূহকে অর্থ ব্যবহার থেকে মুক্ত রাখা। উদাহরণরূপে সেবা, অন্ন, জল, দুধ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ছিল না, সেগুলো ছিল দান করবার জন্য। আজ এসব কিছুরই বাজার তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই ব্যবস্থায় সমৃদ্ধির তো হানি হতোই না বরং বৃদ্ধি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছুর অভাব থাকতো না এবং সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সংস্কারও বজায় থাকতো। আজ এবিষয়ে পুনর্বিচারের প্রয়োজন রয়েছে।

(১১) অর্থব্যবস্থায় গ্রামকে একক মনে করাও ভারতের অর্থনীতিবিদদের এক অত্যন্ত দূরদর্শী পরিকল্পনা ছিল। গ্রামে ব্যবসা কোনো একজন ব্যক্তির ছিল না। ব্যবসার জন্য পরিবারই একক ছিল। গ্রামের আবশ্যকতাসমূহ উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করত। সবার আবশ্যকতার পূরণ হোক তা দেখার ভার গ্রামপ্রধানের ওপর থাকতো। এই দৃষ্টিতে অর্থব্যবস্থা আত্মনির্ভরও ছিল। সমাজ জীবনের সুচারু সঞ্চালনের জন্য এই বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। এটা অত্যন্ত কম ঝামেলার এবং ফলদায়ী হয়ে থাকে।

(১২) আত্মনির্ভরতার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বতন্ত্রতা। আর্থিক স্বতন্ত্রতার অর্থ হচ্ছে নিজেই ব্যবসার মালিক হওয়া। এই

ব্যবস্থার পেছনে এক বড়ো মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা সুসংস্কৃত ব্যবস্থায় নিহিত রয়েছে। কোনো ব্যক্তি অন্য কারও জন্য কেন কাজ করবে? স্বার্থ, ভয়, লোভের বশবর্তী হয়ে করা অর্থাৎ বাধ্য হয়ে করা গোলামির নামান্তর। স্নেহ, আদর, শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধে করা হচ্ছে সেবা। সুসংস্কৃত সমাজ সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং কাউকে কারও গোলামি করতে না হয় তা সুনিশ্চিত করে থাকে। এই দৃষ্টিতে ব্যবসার মালিকানা বা বড়ো ব্যবসার ক্ষেত্রে অংশীদারের ব্যবস্থা করা হয়ে আসছে। এই দৃষ্টিতে চাকরি করাকে হেয় মনে করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে চাকরি যদি করতেও হতো তবে শীঘ্রাতিশীঘ্র তা থেকে মুক্ত হওয়া চাকুরিজীবী ও চাকুরিদাতা উভয়েরই চেষ্টা ছিল। শিক্ষা, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য ইত্যাদি পেশাজীবী কখনও চাকরি করতেন না, কারণ তাঁরা এগুলিকে সেবা মনে করতেন। এর বিনিময়ে তাঁরা অর্থ গ্রহণ করতেন না।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

মৌলবাদীদের উত্থান বাংলাদেশের ক্ষতি করবে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে— 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন থামান। নইলে পেট্রাপোল বন্দর অচল করে দেওয়া হবে।' কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের ঘটনার অজুহাতে বাংলাদেশের কুমিল্লার মুরাদনগরে যেভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেজন্য সেখানকার হিন্দুরা সবার কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কুমিল্লার হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কাঠগড়ায় তুলে বলেছেন, 'বাংলাদেশের সর্বত্রই হিন্দু সম্প্রদায় আতঙ্কে দিন যাপন করছে। শেখ হাসিনা সরকার মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করতে চাইছে। এজন্য তারা হিন্দুদের তাড়াতে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে। এসব কারণে গত বছরে হিন্দু নির্যাতনে জড়িত কারও শাস্তি হয়নি।' তিনি আরও বলেছেন— 'কুমিল্লার মুরাদনগরের নির্যাতনের বর্ণনা শুনে বাকরুদ্ধ ও হতভম্ব হয়েছি। ঘটনার সময় ভয়ে হিন্দু নারীরা হাতের শাঁখা খুলে সিঁদুর মুছে অন্যত্র আশ্রয় নেন। শিশুরা আতঙ্কে বমি করতে শুরু করে। জেহাদিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। স্বর্ণালংকার-সহ বহু মূল্যবান জিনিস লুট করে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করে উল্টে নির্যাতিতদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে জেলে পাঠিয়েছে।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পক্ষ থেকে এ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে ও বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাঁরা বলেছেন— 'আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। ...এই ঘটনার প্রতিকার ও বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তা চেয়ে তারা মোদী সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হুমকি দিয়েছে— 'ওদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ না হলে এশিয়ার বৃহত্তর স্থলবন্দর পেট্রাপোল অবরুদ্ধ করা হবে।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী কুমিল্লার এই ঘটনা সম্পর্কে ভারত সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। লোকসভার বিরোধী দলের নেতার এই দাবির প্রতি ভারত সরকারকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের জন্য আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা একদা পূর্ববঙ্গ ওরফে পূর্বপাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ আকারেপ্রকারে একই দেশ। বারবার তার নাম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু স্বভাবে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দেশের নাম বদল হলেও মনের পরিবর্তন হয়নি, মনের কালো ঘোচেনি। ১৯৪৬-৪৭, ১৯৭০-৭১, ১৯৯৩-তে তাদের যে স্বভাব চরিত্র, ২০০১ হয়ে ২০২০-তে এসেও সেই একই চরিত্র তারা বজায় রেখেছে। পাকিস্তান হাসিলের লড়াই, বাংলাদেশ কায়েমের লড়াই নিয়ে তারা যতই বড়াই করুক, প্রতিবেশী হিন্দুর উপর তারা যে অমানবিক ব্যবহার করে যাচ্ছে তা পশু সমাজকেও লজ্জিত করবে। হিলি, মহদিপুর, গেদে, বনগাঁ বর্ডার পেরোলেই যে বাংলাদেশ নামক দেশটিতে মনুষ্য নামক এমন বেশ কিছু জন্তু জানোয়ারের বাস, তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক বিস্ময়কর খবর ও অভিজ্ঞতাই বটে।

অসহায় নারী জাতির উপর এই পশুসুলভ আচরণকে মুসলমানরা ইসলাম ধর্মানুমোদিতই মনে করে। বিধর্মীর ধর্ম নষ্ট, ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও নারীর ইজ্জত হরণ ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মুসলমানরা সে নির্দেশ অমান্য করতেই পারে না। ফলে বাংলাদেশিদের মাথায় টাক পড়ুক, কিংবা দাড়িতে পাক ধরুক, তার জন্যও হিন্দুদের দায়ী করে তাদের উপর হামলা চালানো হয়। কারো মাথায় চামচিকায় মলত্যাগ করলে কিংবা পায়ে ব্যাঙে প্রস্রাব করলে তার দায় বর্তায় হিন্দুদের উপর। তা না হলে সুদূর ফ্রান্সের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলে? কোনো সমাজে কুকুর-প্রবৃত্তি সম্পন্ন এত লোক যে থাকতে পারে তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু নির্যাতনের

জন্য অনেকেই সোচ্চার হলেও পশ্চিমবঙ্গের ইসলামভক্ত ধর্মনিরপেক্ষী বজ্জাত বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। খবরের কাগজে বাংলাদেশে হিন্দু মা-বোনেদের উপর নির্যাতনের কাহিনি পড়ে এদের কি নিজের মা-বোন-স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে না? এরা নাকি বুদ্ধিজীবী! এরা নাকি শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি সেবক! এদের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি উদারতার বকবকানিতে কান ঝালাপালা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে মুসলমান গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য ও মুসলমান নেতাদের নীরবতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন — ''একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন সে কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সঙ্কোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তারা এ জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই।''

খান সেনাদের অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে বাংলাদেশিরা ভারতের বুকের উপর বসে থেকে, ভারতের খেয়ে-পরে, ভারতের অর্থে ও সেনাদের সাহায্যে বাংলাদেশ হাসিল করার পর হাসতে হাসতে দেশে ফিরে গিয়েছিল তারাই কয়েক বছর পরেই সব ভুলে গিয়ে সেখানকার হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু করেছে যা আজও সমানতালে চলছে। অথচ ভারত বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের দেশের অসুবিধা উপেক্ষা করেও। বাংলাদেশিরা যদি হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ না করে, সরকার যদি তাদের সুরক্ষা না দেয় তাহলে তাদের সঙ্গে— 'মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবে না'— নীতির সামান্য কিছু পরিবর্তন করতে হবে। তবে তাকে হাতে মারার দরকার নেই ভাতে মারার জন্য শুধু সীমান্তমুখী ট্রকগুলির মুখ ঘুরিয়ে দিন কিছুদিনের জন্যে। তাহলেই কত ধানে কত চাল হয় তা বুঝতে পারবে তারা।

বাংলাদেশ ছিল সোনার বাঙ্গলা। সোনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাদ (পান) না মেশালে সোনার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে না, অলংকার টেকসই হয় না, চাকচিক্য খোলে না। কিন্তু খাদ (পান) বেশি হলে আসল সোনা খুঁজে পাওয়া যায় না। সোনার বাঙ্গলারও সেই দশা। আসল সোনাকে পানমরায় খেয়েছে। বিজাতি বিদ্বেষ, বিধর্মী বিদ্বেষে সোনার বাঙ্গলার সোনা উবে গিয়ে তা নিকৃষ্ট বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। এখন হিন্দুহত্যা, হিন্দু

মঠ-মন্দির ভাঙা, হিন্দু সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দু ঘরবাড়ি পোড়ানো, হিন্দু স্ত্রী-কন্যা অপহরণ ও ধর্ষণই বাংলাদেশের অলংকার। সোনার বাঙ্গলার সোনার মানুষ ইসলামি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আজ লুণ্ঠক, ধর্ষক ও কামুক নরপশুতে রূপান্তরিত। সেখানে তসলিমা নাসরিন, দাউদ হায়দাব, হুমায়ুন আজাদ, সালাম আজাদ, ড. কিবারিয়া, শাহরিয়ার কবিরা নিয়ম নন, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

বাংলাদেশে যতগুলি রাজনৈতিক দল আছে প্রত্যেক দলই ইসলামি সংস্কৃতিতে লালিত, পালিত, জারিত— যে সংস্কৃতির মূল কথা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। আর তখনই মনে পড়ে জনৈক সহৃদয় মুসলমান শিক্ষকের হিতোপদেশ তাঁর পরীক্ষাউত্তীর্ণ বেকার হিন্দু ছাত্রদের প্রতি— 'তোমরা বুঝতে পারছ না, পাকিস্তান (পড়ুন বাংলাদেশ) তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। এখানে কেন চাকুরির চেষ্টায় জীবনটা নষ্ট করতেছ। সময় থাকতে ভারতে চইলা যাও। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও।'

২০২৫ সালের মধ্যে হিন্দুশূন্য হবে বাংলাদেশ। সেখানকার মৌলবাদীদের এই ঘোষণার পর বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর সাধারণ বৈজ্ঞানিক সূত্র বা নীতি (the theory of evolution)— 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে (The every action has its own opposit reaction)' তা যদি ভারতে ঘটে তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়া যাবে? সহ্যেরও একটা সীমারেখা আছে। কোথায় গেলেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপুমুন্সি, আর্থিক বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমানরা— যাঁরা গত বছর অসমে এসে বলেছিলেন— 'বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত কিন্তু ভারতের মুসলমানরা নিরাপদ নন।' তাঁরা কি এখন চোখে ঠুলি পরে আছেন? নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত। ▯

রাষ্ট্রবাদী কৃষক সমাজের মুখপত্র ভারতীয় কিষাণ বার্তা

তন্ময় দে

সম্পাদক ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় একটি সমৃদ্ধ ও তথ্যনির্ভর সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যার সম্পাদকীয় কলমে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটি আভাস দিয়েছেন। বর্তমানে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মনির্ভর হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা। এই মহান লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বদেশীর উপর জোর দিতে হবে এবং এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদেশী মানসিকতা গড়ে তোলা। কারণ মানসিক পরিবর্তনের সূত্র ধরেই জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

বলরাম জয়ন্তীতে কৃষি দেবতার আরধানায় শামিল সমগ্র রাজ্য : গত ২৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বলরাম জয়ন্তী পালিত হয়েছে। মহাভারতের একজন নিরপেক্ষ বলশালী মানুষ হয়েও ভগবান বলরাম সাধারণ হলধর তথা কৃষকের মূর্ত প্রতীক হয়ে আজও সকলের হৃদয়ের আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। শিল্পী শীর্ষ আচার্যের আঁকা বলরামের ছবিটি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে বলরামকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ। সাধারণ মানুষ তাদের সাধ্যমতো আয়োজন করে এই জয়ন্তী পালন করেছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই পরম সত্যকে যার নিহিতার্থ হলো কৃষকের কাঁধে ভর করেই এই সমাজ দণ্ডায়মান এবং তার অন্নেই পালিত হয় এই পৃথিবী। এই জয়ন্তী পালনের মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হয় যে কৃষক কোনো দল বা বিচ্ছিন্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে একটি বৃহৎ পরিবারের সদস্য।

কৃষিবিল ২০২০ ও ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অবস্থান : পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান মজবুত করার জন্য ভারত সরকার ২০২০ সালে তিনটি আইন পাশ করেছে যা ৫ জুন ২০২১ সালে সারা ভারতে লাগু হবে। নতুন কৃষি আইনে মধ্যস্বত্বভোগীদের সরিয়ে যাতে কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভারতের যে কোনো প্রান্তে বিক্রি করতে পারে সেই স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হয়েছে। কৃষককে কেবল জমিতেই আবদ্ধ না রেখে একটি বৃহৎ পরিসরে পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নিয়েই যে এই বিল তার স্বপক্ষে কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর ২৪ সেপ্টেম্বর দুটি টুইটের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে এই বিল চাষিকে বীজ বপনের সময় থেকেই ফসলের গ্যারান্টি দেবে এবং এমএসপি যেহেতু আইনের অঙ্গ কখনোই ছিল না তাই এক্ষেত্রেও এটিকে আইনের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মহামন্ত্রী বদ্রি নারায়ণ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেছেন। ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের তরফে বলা হয়েছে, যদিও তারা আশা করে এই বিল কৃষককে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করবে তবুও এতে মিনিমাম সাপোর্টিং প্রাইসের কথা না থাকায় তা চিন্তার বিষয় এবং এই কারণে কেন্দ্র সরকারের কাছে ওই বিলে বেশকিছু পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কৃষিবিল নিয়ে আলোচনার জন্য নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ অক্টোবর 'কৃষি আইন ২০২০, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ'-এর উপর কল্যাণীর সয়ম্বর হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী-সহ একাধিক বিদ্বজনেরা। সভায় ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায় বলেন, তারা কেন্দ্র সরকারের কাছে চারটি দাবি উপস্থাপন করেছেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার সম্পাদক মিলন খামারিয়ার আহ্বানে নদীয়া জেলার পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় যাতে 'মাকাইয়াস'-এর অধিকর্তা ড. স্বরূপ প্রসাদ

ঘোষ তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। সভার সভাপতি ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এই বিল নিয়ে সঙ্ঘের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। অক্টোবরের ৬ তারিখে কলকাতা জেলা কমিটির তরফ থেকেও কৃষিবিল নিয়ে আলোচনার জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, সেখানে ড. সোমশুভ্র গুপ্ত,ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. কল্যাণ জানা-সহ রাজ্য ও জেলার কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জন্মশতবর্ষের আলোকে রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ী : সম্পাদক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবন ও ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আলোকপাত করেন। ঠেংড়ীজী ১৯২০ সালের ১০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার আর্বি গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও নিজ কীর্তির দ্বারা একসময়ে সমগ্র ভারতের চোখের মণি হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯৩৬ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন । তিনি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ-সহ একাধিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি সংগঠন কীভাবে মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে রাষ্ট্রকল্যাণের কাজে নিয়োজিত হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখেছেন তিনি। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি, স্বদেশীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ, কৃষকের অবস্থার মানোন্নয়ন-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন বিদেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বা তাদেরকে অনুকরণ করে কখনো একটি দেশের উন্নতি হতে পারে না, তাই আত্মনির্ভর হিসেবেই মানুষকে গড়ে

তুলতে হবে। দীনদয়াল উপাধ্যায়, বি আর আম্বেদকর প্রমুখের দ্বারা অনুপ্রাণিত ঠেংড়ীজী গ্রাম সংসদকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের অন্যতম কারিগর ছিলেন। ভারতীয় কৃষকদের দুরবস্থা তাকে ব্যথিত করেছিল এবং তাদের কল্যাণের জন্য তিনি ১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ রাজস্থানের কোটা শহরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। একজন বলিষ্ঠ সংগঠক ও নেতা হয়েও কীভাবে অহংকারমুক্ত থাকা যায় তা ঠেংড়ীজীকে না জানলে বোঝা একটু কঠিন হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষকের হাতেই দেশের ভিত্তি মজবুত হবে এবং সেই কারণে কৃষকের সামাজিক ও আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে একটি সংগঠন পরিচালনার জন্য নেতার প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই, তবে যে কোনো সংগঠনের মূল শক্তি নিহিত থাকে তার কার্যকর্তাদের হাতেই। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সহজ সরল জীবনশৈলীর অধিকারী ঠেংড়ীজী বিভন্ন সময়ে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটকালে এগিয়ে এসেছেন। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে যখন বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল তখন ঠেংড়ীজী নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে খুব শীঘ্র এই অত্যাচারী শাসকের পতন হবে। তাঁর সেইকথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় এবং গ্রন্থে নিজের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন যা একদিকে যেমন তাকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনই সমসাময়িক সময়কে বুঝতেও সাহায্য করে।

নদীয়া জেলা কমিটির কার্যক্রম : গত ১৪ আগস্ট ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের নদীয়া জেলা কমিটি গঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ বন্ধু। এছাড়াও বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. কল্যাণ জানা এবং ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। সেদিন কমিটির সভাপতিত্ব-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়। ড. মানবেন্দ্র রায়, ড. বিপ্লব লৌহ চৌধুরী, ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ কৃষকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নদীয়া জেলা কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তাদের আলোচনার মাধ্যমে বারবার তুলে ধরেন। জোল সম্পাদক শিক্ষক মিলন খামারিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে কৃষকেরা যাতে তাদের সরকারি সুযোগ সুবিধা পায় তা সুনিশ্চিত করাই কমিটির অন্যতম লক্ষ্য।

কালিম্পং জেলার কার্যক্রম : গত ৬ অক্টোবর ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কালিম্পং জেলা সমিতির সহায়তায় আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। দার্জিলিং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের হোম সায়েন্সের বিজ্ঞানী শ্রীমতী আকৃতি প্রধান ও কর্মী সন্দীপ থাপার উদ্যোগে স্থানীয় কৃষক পরিবারের মহিলাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ-সহ কৃষকদের জৈবিক উপায়ে কৃষিকাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কার্যক্রমে স্থানীয় দেবীধারা সহায়ক গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এরপর ৯ অক্টোবর কালিম্পং জেলা সমিতির সম্পাদক পঙ্কজ সাপকোটার আহ্বানে জৈব কৃষি সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম এবং ১২ তারিখে জেলা সমিতির যুব প্রমুখ মহেশ দালালের আহ্বানে জৈব কৃষি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য আরেকটি কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সেবাকাজ : করোনার পরিস্থিতিতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ তাদের মানবিক মুখ নিয়ে দেশসেবায় নিজেদের ভূমিকার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ৬৭৫টি দুঃস্থ পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও সঙ্ঘের তরফে এক লক্ষ দুই হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে। এই সময়ে ৫০টি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং সাংগঠনিক উদ্যোগের পাশাপাশি সঙ্ঘের সদস্যরা ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বহু মানুষকে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে নদীয়া জেলার সভাপতি ড. সন্দীপ কীর্তনিয়া ও আশুতোষ কীর্তনিয়ার কাজ যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা প্রসার ভারতীর অনুগ্রহ, সমীক্ষা এবং সংশোধন জরুরি : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা আয়োজিত হয়। ভারতের মতো জলবায়ুগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশে ১২৫ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলে সভায় বলা হয়েছে। খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি বেশ কিছু গাছ এমনও রয়েছে যেগুলিকে ঔষধি গাছ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে দুর্ভাগ্য যে এই বিষয়ে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সঙ্ঘের উদ্যোগে ভারতের ৫০০-এর বেশি জেলায় 'নেশামুক্ত মানব ও রসায়ন মুক্ত কৃষি', স্লোগান দিয়ে ব্যাপক প্রচারের কাজ করা হয়েছে। তবে তৃণমূলস্তরে এই কাজের সাফল্য তেমন দেখা না যাওয়ায় সঙ্ঘ মোটেই খুশি নয়। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ভারতে এআইআর ও ডিডি কিষাণের উদ্যোগে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। দুঃখের বিষয় যে, এই মাধ্যমগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রয়োগের বিষয়েই কথা বলে। এর ফলে কৃষকেরা জৈবিক উপায়ে কৃষিকাজ করবে নাকি তারা রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিকাজ করবে তা নিয়ে তারা দ্বন্দ্বে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের উদ্যোগে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

জেলায় জেলায় দাবি সনদ প্রদান : পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কারণ তারা দালালদের দ্বারা শোষিত হন। যেখানে কেন্দ্র সরকারের লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সেখানে এই রাজ্যের কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ অত্যন্ত চিন্তান্বিত। সঙ্ঘের উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০-তে নদীয়ার জেলাশাসক ও সভাধিপতির কাছে বৈদ্যুতিন ডাক মারফত চার দফার একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে, যাতে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করা হয়েছে।

নদীয়া জেলা সমিতির সম্পাদক মিলন খামারিয়া বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমি ভারতের মধ্যে উন্নত হলেও এখানকার কৃষকেরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। কারণ তাদের লাভের ধন ফড়েরা খেয়ে নিচ্ছে।' এই ফড়েদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য সঙ্ঘ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা যে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে সেই বিষয়ে নদীয়া জেলার সভাপতি ড. সন্দীপ কীর্তনিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। □

সঠিক খাদ্য চয়নের মাধ্যমে থাইরয়েডের সমস্যা থেকে মুক্তি

ত্রিয়া সিংহ

বর্তমান সময়ে অসুখ যেন প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে গেছে এবং একবার জাঁকিয়ে ধরলে যেন ছাড়বার নামই নেই। তার জন্য অনেকটাই দায়ী আমাদের আধুনিক জীবনশৈলী। আধুনিকালে অলস জীবন যাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ফলে আমাদের বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এমনই একটি রোগ হলো থাইরয়েডের সমস্যা। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আমরা বলে থাকি Hypothyroidism। এটি এমন একটি শারীরবৃত্তীয় অবস্থা যার ফলে আমাদের দেহে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন ক্ষরিত হতে পারে না। আমাদের দেশে প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ এই রোগের শিকার। প্রতি দশজনে একজন এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই হতে পারে। তবে সমীক্ষয় দেখা গেছে পুরুষের তুলনায় মহিলা আক্রান্ত হন বেশি। এবার প্রশ্ন হলো, এই রোগে আক্রান্ত কিনা তা কীভারে বোঝা যাবে?

Hypothyroidism-এ আক্রান্ত রোগীর দেহের ওজন অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় এবং তা সহজে কমানো সম্ভব হয় না। তাছাড়াও ক্লান্তি ও অবসাদ গ্রাস করে, ত্বক ও চুল শুষ্ক হয়ে যায়, চুল ঝরে পড়তে শুরু করে, অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, কোষ্ঠকঠিন্যে দেখা দেয়, হৃদ স্পন্দনের হার কমে যায়, মাংসপেশীতে টান অনুভূত হয়, সঙ্গে অনিয়মিত ঋতুচক্র ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস — ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের শুরুতে এই লক্ষণগুলি প্রকট ভাবে প্রকাশ না হলেও ক্রমশ সেগুলির উপস্থিতি জানান দেয়। ড উপসর্গগুলি উপলব্ধি হলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

থাইরয়েডের সমস্যায় কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, যেগুলি আমাদের পথ্য থেকে বাদ দিতে হবে, যাকে আমরা বলি Goitrogenic food. এগুলি হলো বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকোলি, পালং, মিষ্টিআলু, বাজরা ও তার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য। এইসব খাদ্যে goitrogen নামক এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান যা থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিন গ্রহণে বাধা দেয় এবং থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনে ব্যাহত করে। এছাড়াও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য, যেমন— কেক, পেস্ট্রি, কুকিস, চিজ, সাদা পাউরুটি এবং এগুলির সঙ্গে প্যাকেটজাত খাবার, অতিরিক্ত ফ্যাটজাতীয় খাবার— ঘি, মাখন ইত্যাদি এড়িয়ে চলা উচিত। থাইরয়েড হরমোনের সক্রিয়তার জন্য কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে। যেমন—আয়োডিন, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, আয়রন ও কপার — এগুলি আমাদের দেহে একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজি ও ফল, ডিম, মাছ, মাংস, দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য (দই) পথ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

রোগ থেকে রেহাই পেতে শৈশবকাল থেকে পথ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সবুজ শাকসবজি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য রাখতে হবে। শিশুদের বাছাই করা খাদ্যের পরিবর্তে দিতে হবে সুষম খাদ্য। পথ্যে যেন পাঁচটি শ্রেণীর খাদ্যই উপস্থিত থাকে। যেগুলি হলো— (ক) দানা শস্য, (খ) ডাল, (গ) ডিম, মাছ অথবা মাংস, (ঘ) ফল ও সবুজ শাকসবজি এবং (ঙ) দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। শৈশবকাল থেকে শিশুর ওজন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তারা যাতে কখনই অতিরিক্ত ওজন বা মেদবাহুল্যতার শিকার না হয়ে পড়ে।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস রোগের উপশমে বিপুল সাহায্য করে। খাবারের পাশাপাশি দৈনিক শরীরচর্চা অত্যাবশ্যক। তাই রোগে ভোগার চেয়ে তার প্রতিরোধ করাই শ্রেয়। বলাবাহুল্য, আগের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। তবে আরেকটু সচেতনতা বাড়ালে এইসব রোগের হাত থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

(লেখিকা একজন পুষ্টিবিদ)

বেদনা অতুল প্রসাদের সংগীতের প্রধান অবলম্বন

রূপশ্রী দত্ত

অতুলপ্রসাদ সেন (২০ অক্টোবর ১৮৭১, ২৬ আগস্ট, ১৯৩৪), বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। গানগুলির বিষয়বস্তু হলো, দেশপ্রেম, ভক্তি ও মানবপ্রেম। তাঁর জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণা তাঁর গানের ভাষায় বাঙ্ময় মূর্তি ধরেছিল। বেদনা তাঁর সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন।

১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর, অতুলপ্রসাদ ঢাকায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস শরিয়তপুরের মগর গ্রামে। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হয়ে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। কালীনারায়ণ ভগবদ্ভক্ত, ভক্তিগীতি রচয়িতা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। সংগীত বিষয়ে অতুলপ্রসাদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতামহের কাছেই। ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করে লন্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য আইনশিক্ষা করেন। আইন পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে, ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি লক্ষ্ণৌ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন। তিনি পরহিতব্রতী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ও গ্রন্থস্বত্ত্ব তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর বাসগৃহের সন্নিহিত অঞ্চল, স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনের জন্য দান করে গিয়েছিলেন। তাঁর বিবাহ সুখের হয়নি। অনতিকাল পরেই বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল।

অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গান লক্ষ্ণৌতে রচিত। বাংলার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরীতি মিশিয়ে তিনি বাংলা ঠুমরি রচনা করেছিলেন। 'কি আর চাহিব বলো', 'ওগো নিঠুর দরদী', 'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে'— তাঁর রচিত বাংলা ঠুমরির কয়েকটি নিদর্শন। তিনিই প্রথম বাংলায় গজল রচনা করেন।

'গীতিগুচ্ছ' গ্রন্থে তাঁর সমস্ত সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা ২০৮। তাঁর বিখ্যাত গানের মধ্যে, 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'মিছে তুই ভাবিস মন', সবারে বাসরে ভালো', 'ক্রন্দসী পথচারিণী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'মোদের গরব, মোদের আশা'— দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'দেবতা', 'মানব', 'স্বদেশ', 'প্রকৃতি' ও 'বিবিধ'— এই পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত তাঁর গান। রবীন্দ্রনাথও অতুলপ্রসাদের গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। সংগীতশিল্পী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদের গান গেয়েই সংগীতজগতে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনী'র অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। এই সংস্থার মুখপত্র 'উত্তরা'র তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি ১৯৩৪-এর ২৬ আগস্ট মারা যান। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।গাজীপুরে তাঁর স্মৃতিফলকের বাণী— 'মোদের গরব মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা/ মাগো, তোমার কোলে তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা।' ১৯৭০ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গুলি লেগে এটি ভেঙে যায়। নতুন স্মৃতিফলকে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখের সঙ্গে লিখিত আছে— 'আমার যে শূন্য ডানা তুমি ভরিয়ো, আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।' ▯

বারুইপুরে রাসমেলা

সপ্তর্ষি ঘোষ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ বারুইপুর। বারুইপুরে প্রতি বছর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় রাসমেলা। এই মেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ মেলাগুলির অন্যতম। এবছর রাসমেলা ২২৭ বছরে পদার্পণ করলো। রাস উৎসব মূলত বারুইপুরের প্রাক্তন জমিদার রায়চৌধুরীদের পারিবারিক অনুষ্ঠান হলেও কালক্রমে এই মেলা সর্বজনীন মেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কীভাবে বারুইপুরের রাসমেলার সূত্রপাত হয়েছিল, সে বিষয়ে একটি সুন্দর লোকশ্রুতি আছে। কথিত আছে, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনার বারো ভুঁইয়ার প্রধান প্রতাপাদিত্য মোগল সেনাপতি ইসমাইল খাঁর কাছে পরাজিত হবার পর প্রতাপাদিত্যের বহু বীর সৈনিক বর্তমান সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেন। এদের মধ্যে অন্যতম মদন রায় গঙ্গার তীরে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রায়মঙ্গল কাব্যে মদন রায়ের নাম পাওয়া যায়। মদন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীরাম এই অঞ্চলের জমিদারি চালাতেন। শ্রীরামের অকাল প্রয়াণে তাঁর পুত্র দুর্গাচরণ দীর্ঘদিন জমিদারি চালবার পর পুত্র কালীশঙ্কর রায়কে দিয়ে যান। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কালীশঙ্কর পুত্র রাজবল্লভ রায় নানা কারণে রাজপুর গ্রাম পরিত্যাগ করে বারুইপুরে জমিদারি পত্তন করেন। জমিদার রাজবল্লভ ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি নিজের বাড়িতে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার্চনা করতেন। এ সময়েই বারুইপুরে রাস উৎসবের সূচনা হয় জমিদার রাজবল্লভ রায়ের উৎসাহ ও উদ্যোগে।

বারুইপুরের মাটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধন্য। সে আর এক কাহিনি। রাসমেলা শুরুর বহু আগে ইংরেজি১৫১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর অদ্বৈত আশ্রম থেকে পদব্রজে আদিগঙ্গার তীর ধরে নীলাচলে যাবার পথে বারুইপুরের আঁটিসারা গ্রামে অনন্ত আচার্যের বাসভবনে একরাত্রি সংকীর্তনে অতিবাহিত করেছিলেন। জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারে এর প্রভাব পড়ে। তারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এখনও রায়চৌধুরী পরিবারে প্রাচীন প্রথা বর্তমান।

প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্য তিথি থেকে রায়চৌধুরী বাড়ির সমমুখস্থ 'আট বিঘা ময়দান'-এ রাসমেলা শুরু হয়। রাস পূর্ণিমার শুভলগ্নে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা এবং আতসবাজির প্রদর্শনীর মাধ্যমে রায়চৌধুরী পরিবারের কুলদেবতা রাধামাধব জিউ ভক্তবৃন্দ দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাসমঞ্চে এসে অধিষ্ঠান করেন। তিনদিন ধরে পূজার্চনা চলে। এই সময় স্থানীয় আচার্য ব্রাহ্মণরা কীর্তন সহযোগে সারা বারুইপুর শহর প্রদক্ষিণ করেন। বর্তমানে দেবোত্তর মন্দির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছেন রায়চৌধুরী পরিবার। এ বছর রাসমেলা শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৩ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) থেকে। কিন্তু করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে প্রশাসন থেকে মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই বারুইপুরের অধিবাসীরা এজন্য বিষণ্ণ ও মর্মাহত। তবে যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সরকারি স্বাস্থবিধি মেনে যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। ▯

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

SURYA

Energising Lifestyles

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

lighting

fans

appliances

pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni